নবীন বিজ্ঞানী

প্রকাশকাল: মার্চ, ২০২৬খ্রিঃ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
সুকল্যান বাছাড়
সিনিয়র কিউরেটর

সম্পাদকমন্ডলী
মোঃ হাদিসুর রহমান
লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার

এম.এম. রুবায়েত হোসেন
সহকারী কিউরেটর

শাফিয়া তাসনীম দ্রাঘিমা
সহকারী কিউরেটর

রবিন বসাক
সহকারী কিউরেটর (চলতি দায়িত্ব)

ফরহাদ শেখ
সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার

প্রকাশনায়
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

যোগাযোগ-
ফোন: ০২-৫৮১৬০৬০২
ই-মেইল: infonmst@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.nmst.gov.bd

মূল্য: ১০০ টাকা।



বাণী

একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে বিশ্ব এক অভাবনীয় প্রযুক্তিগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ধাবিত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো উদ্ভাবনসমূহ আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ও চিন্তার জগতকে আমূল বদলে দিচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে নিজেদের টেকসই ও দক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আগামীর এক সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয়ে দেশের তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক ও সৃজনশীল চিন্তাশক্তিতে বলীয়ান করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোকে সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে গবেষণার আগ্রহ সৃষ্টি করাই আমাদের মূল অভিপ্রায়। 'নবীন বিজ্ঞানী' ম্যাগাজিনটি সে লক্ষ্য পূরণে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ইতোমধ্যে পাঠকদের মনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। 'এপ্রিল ২০২৬'-এর এই বিশেষ সংখ্যাটিতে বিজ্ঞানের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দেশের প্রথিতযশা লেখক ও শিক্ষকদের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এই প্রকাশনাটি তরুণ পাঠকদের সৃজনশীল চিন্তাকে আরও শাণিত করবে এবং তাদের মাঝে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে সহায়ক হবে।

যেসব লেখক তাঁদের মূল্যবান লেখনীর মাধ্যমে এই সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি, জাদুঘরের যেসকল সহকর্মী তাঁদের মেধা ও শ্রম দিয়ে এই প্রকাশনাটি সফলভাবে পাঠকের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মুনীরা সুলতানা (এনডিসি)
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

সূচিপত্র

১. বাংলাদেশের ঔষধী উদ্ভিদের পরিচিতি ও উপকারিতা মুনীরা সুলতানা এনডিসি	০৫
২. প্রাণিজগতে রক্তের রং ড. মো. নিয়ামুল নাসের	১৭
৩. মাইক্রোগ্রিন: সুপারফুড পটেনশিয়ালসহ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ সুকল্যান বাছাড়	২১
৪. পলিথিনের ব্যবহার রুখতে হবে অধ্যাপক মোঃ সিরাজুল ইসলাম	২৬
৫. চন্দ্রজয় থেকে মঙ্গল গ্রহ জহুরুল হক বুলবুল	৩৩
৬. জেমস ওয়াটসন : ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের সহ-আবিষ্কারক নিশাত বেগম	৪৬
৭. বাংলাদেশের বহুল পরিচিত দশটি গায়ক পাখি সুমন মণ্ডল	৫০
৮. ফুলের গন্ধের নেপথ্যে ড. আমানুল ইসলাম	৫৮
৯. ষষ্ঠ শিল্প বিপ্লব ও বাংলাদেশ মোঃ রাফি	৬১

বাংলাদেশের ঔষধি উদ্ভিদের পরিচিতি ও উপকারিতা

মুনীরা সুলতানা এনডিসি

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে, যা ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। সুপ্রাচীনকাল থেকে এগুলো ব্যবহার হয়ে আসছে। ধারণা করা হয় যে বাংলাদেশে চার হাজার প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে অর্ধেকই কোন না কোন ঔষধি গুণসম্পন্ন। বাংলাদেশের উর্বর মাটি, আর্দ্র আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক অবস্থান একে অসংখ্য উদ্ভিদরাজির চারণভূমিতে পরিণত করেছে। আদিকাল থেকেই বাংলার মানুষ রোগ নিরাময়ে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসারের আগে এবং বর্তমানেও গ্রামীণ ও আদিবাসী জনপদে ঔষধি উদ্ভিদই হলো প্রাথমিক চিকিৎসার প্রধান উৎস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, বিশ্বের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য কোনো না কোনোভাবে ভেষজ ওষুধের ওপর নির্ভর করে।

অনেক সময় নিজে থেকে জন্মানো ভেষজ উদ্ভিদসমূহকে জঙ্গল মনে করে অজ্ঞতাহেতু বাগান থেকে অপসারণ করা হয়ে থাকে। ভেষজ উদ্ভিদের উপকারিতা জানা থাকলে এমন হতো না। দেশের তরুণ প্রজন্মের নিকট বাংলাদেশের নানা স্থানে জন্মে থাকা কিছু ভেষজ উদ্ভিদের পরিচিতি ও এগুলোর উপকারিতা অবহিত করার জন্য এই লেখা। আমার শিশু বেলায় দেখেছি শরীরের কোথাও কেটে বা ছড়ে গেলে গাঁদা ফুলের পাতা ডলে কাটা বা ছড়ে যাওয়া স্থানে লাগিয়ে দেয়া হতো; পেট খারাপ হলে থানকুনি পাতা পানিতে জ্বাল দিয়ে সেই পানি ছেঁকে পান করানো হতো। মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য কেশুতি নামে গুল্মর পাতা বেটে মাথায় দেয়া হতো। বর্তমানে আধুনিক ডিজিটাল যুগে একদিকে যেমন মানুষ রাসায়নিক প্রোডাক্টের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে আবার সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন জৈব বা অরগানিক প্রোডাক্টের প্রতিও মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অরগানিক প্রোডাক্টের উপকরণের হিসেবে যেসকল কাঁচামাল দরকার, তা বাণিজ্যিকভাবেও চাষ করা হচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশে ভেষজ উদ্ভিদের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে যা বেকারত্ব কমাতে সহায়ক হতে পারে। বাংলাদেশের প্রকৃতির পরম ভাণ্ডার সকল ঔষধি উদ্ভিদ নিয়ে স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয় বিধায় এই লেখায় মাত্র ২৫টি ঔষধি উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও এর ঔষধি গুণাগুণ উল্লেখ করা হলো। এই উদ্ভিদগুলার মধ্যে বেশ কিছু ঢাকার রমনা পার্কে রয়েছে। লেখাটিতে ভেষজ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহার করা হয়নি এজন্য যে পাঠক যেন স্থানীয় পরিচিত নামে উদ্ভিদগুলোকে চিনতে ও জানতে পারে।

বাংলাদেশে সচরাচর ব্যবহৃত কিছু ঔষধি উদ্ভিদ ও এর উপকারিতা:

১। অর্জুন

পরিচিতি: অর্জুন বৃহদাকৃতির পত্রঝরা বৃক্ষ। উচ্চতায় এটি ২৫ মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। গাছটির মাথা ছড়ানো, ডালগুলি নিচের দিকে ঝুলানো থাকে, বাকল মসৃণ। অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন মাসে পাতা ঝরে এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নতুন পাতা গজায়। ছাল খুব মোটা এবং ধূসর বর্ণের। ফল দেখতে কামরাংগার মতো তবে আকারে ছোট। রাস্তার দু'পাশে এবং চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনাঞ্চলে প্রচুর অর্জুন গাছ জন্মে থাকে। অর্জুনের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা যায়। প্রধানত ছাল, তবে ক্ষেত্র বিশেষে পাতা ও ফল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্যবহার:

- রক্তে নিম্নচাপ থাকলে অর্জুনের ছালের রস সেবনে উপকার হয়।



▸ রক্তক্ষরণে ৫-৬ গ্রাম ছাল রাতে পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে ছেঁকে পানি খেলে আরোগ্য হয়।
▸ শ্বেতবা রক্ত, প্রদরের ছাল ভিজানো পানি আধ চামচ কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে খেলে রোগের উপশম হয়।
▸ ক্ষয় কাশে অর্জুনের ছালের গুঁড়া বাসক পাতার রসে ভিজিয়ে ঘি, মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।
▸ রক্ত আমাশয়ে অর্জুন ছালের চূর্ণ ছাগলের দুধ মিশিয়ে খেলে সেরে যায়।
▸ কাঁচা পাতার রস সেবনে আমাশয় রোগ ভাল হয়।

২। অনন্তমূল



পরিচিতি: সরু এবং লতা জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা লোমযুক্ত এবং কাণ্ডের দু'দিকে জন্মায় কিছুটা ডিম্বাকৃতির অথবা লম্বা এবং আগার দিকটা মোটা থাকে। ফলের বাইরের দিকের রঙ সবুজ আর ভেতরে বেগুনি। বীজ ছোট ও চ্যাপ্টা, রঙ কালো। গাছের পাতার মাঝখানে সাদা দাগ থাকে। ঢাকা ও ময়মনসিংহের শালবনে এ গাছ বেশি দেখা যায়।

ব্যবহার:

▸ **অর্শ (ফিস্টুলা):** তিন গ্রাম অনন্তমূল বেটে গরুর দুধের সঙ্গে জ্বাল দিয়ে দই পাততে হবে। পরের দিন সে দই খেলে অর্শ-রোগে অবশ্যই উপকার হবে।
▸ **পাথরীর যন্ত্রণা:** গরুর দুধ দিয়ে ২/৩ গ্রাম অনন্তমূল বেটে খাওয়ালে খুব তাড়াতাড়ি রোগী অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পায়।
▸ **জিহ্বাক্ষত:** ২০ মিলিমিটার ভেড়ার দুধে শুকনো অনন্তমূল ঘষে মাঝে মাঝে ক্ষতস্থানে লাগালে জিভ ও মুখের ঘা সারে।
▸ **অনিয়মিত মাসিক:** তিন গ্রাম অনন্তমূল সামান্য পানি দিয়ে বেটে এক কাপ জ্বাল দেয়া গরুর ঠাণ্ডা দুধে মিশিয়ে সকাল-বিকেল মোট দুবার খাওয়ালে মাসিক নিয়মিত হবে এবং স্রাবে কোন দুর্গন্ধও থাকবে না।

৩। অশোক



পরিচিতি: অশোক মাঝারি আকৃতির চিরসবুজ, বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট ছায়াতরু বৃক্ষ। কাণ্ড মসৃণ, ধূসর ও উন্নত। পূর্ণ বয়স্ক গাছ ২৫ থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা বিরাট আকৃতির ৫ থেকে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। ডাঁটায় সাধারণত ৫-৬ জোড়া পাতা হয়। কচি পাতার বর্ণ কালচে ও তামাটে হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে লালচে কমলা রঙের ফুল হয়।

ব্যবহার:

- প্রস্রাব বন্ধ হলে অশোকের একটি বীজ ঠাণ্ডা পানিসহ বেটে খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- অত্যন্ত পিপাসা বোধ করলে অশোকের কিছু ছাল বেটে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে পান করলে পিপাসা বোধ কমে আসে।

৪। অশ্বগন্ধা



পরিচিতি: অশ্বগন্ধা ঝোপ জাতীয় গাছ এবং এর মূল ব্যবহৃত হয়। এর মূল আঙুলের ন্যায় এবং ভাঙলে ভিতরে সাদা দেখা যায়। পাতা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু ও ডাঁটার গা শুষ্ক সাদা লোমযুক্ত। এ গাছ উচ্চতায় ও গঠনে অনেকটা বেগুন গাছের মতো। সাধারণত ৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। গাছের যে অংশে পাতা বের হয় সেখান থেকে সবুজ বহিরাবরণে ঢাকা মটরের মতো ফল হয়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত। ফল গোলাকার সবুজ, পাকলে লাল বর্ণ ধারণ করে। বীজ মসৃণ ও চ্যাপ্টা। শিকড় নরম ও ঘোড়ার গন্ধের মতো বলে একে অশ্বগন্ধা বলা হয়।

ব্যবহার :

- শোথ (Edema) রোগ হলে চার গ্রাম পরিমিত অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ ঘি ও মধুসহ খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- কফ রোগে তিন গ্রাম পরিমিত অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ গরম পানির সংগে খেলে কফ রোগ ভালো হয়।
- শ্বাস রোগে অশ্বগন্ধার মূলের ছাই, মধুসহ খেলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

৫। অড়হর



পরিচিতি: অড়হর শাখা-প্রশাখাযুক্ত গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। ২ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। গাছ শক্ত হলেও শাখা-প্রশাখা নরম। প্রতিটি বৃন্তে ৩টি করে পাতা থাকে। পাতাগুলো ৫-৭ সে.মি. লম্বা ও ১-১.৫ সে.মি. বা আধা ইঞ্চি চওড়া এবং নিচের দিকে অপেক্ষাকৃত সাদা হয়।

ব্যবহার:

- **জণ্ডিস রোগে:** অড়হর পাতার রস ২/৩ চা চামচ একটু লবণ মিশিয়ে খাবার পর সামান্য গরম করে একবার খেতে হবে।
- **অরুচিতে:** ডালের জুস পরিমাণমতো আদা, মরিচ, অল্প লবণ মিশিয়ে দিনে এক দেড় কাপ অল্প অল্প করে খেতে হবে।
- **অর্শরোগে:** পাতার রস ২ চামচ একটু গরম করে সকাল-বিকেল ২ বার খেতে হবে।

৬। আমলকী



পরিচিতি: আমলকী মাঝারি আকৃতির পত্রঝরা উদ্ভিদ। উচ্চতায় এটি ২০-৩০ ফুটের মতো হয়। পাতা যৌগিক, ছোট চিকন আকৃতির, ফল গোলাকৃতির এবং হালকা সবুজ বর্ণের।

ব্যবহার:

- আমলকী হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও যকৃত, পেশি ও স্নায়ুমণ্ডলের শক্তিবর্ধক।
- রক্ত পরিষ্কারক, চর্মের লাবণ্যতা ফিরিয়ে আনে, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে ও পিপাসা নিবারণ করে।
- আমলকীর তেল ব্যবহারে চুল কালো হয়, চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং ভাল ঘুম হয়। আমলকীর রস এবং গুঁড়া বাদাম তেলে মিশিয়ে চিনিসহ খালি পেটে ২৫ গ্রাম পরিমাণ খেলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সবরকম চোখের রোগে উপকাবী।
- এছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং অর্শরোগে উপকারী।

৭। কদবেল



পরিচিতি: কদবেল গাছ ১২-১৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। বেশ শক্ত ধরনের পত্রঝরা বৃক্ষ। পাতা দেখতে অনেকটা কামিনী ফুলের পাতার মতো। পত্রদণ্ডের দুদিকে ৫/৬টি করে পাতা থাকে। গাছে ছোট, সোজা ও শক্ত কাঁটা থাকে। ফিকে লাল বা সাদা ফুলের ব্যাস প্রায় ১.২৭ সে. মি.। প্রতি ফুলে ৫/৬টি লোমযুক্ত পাপড়ি তাকে। ফল ছোট বেলের মতো।

ব্যবহার:

- ফলের বীজ হৃদরোগে কার্যকরী।
- রক্ত আমাশয়ে কদবেলের আঠা মধুসহ খেলে বিশেষ উপকার হয়।
- পাকা ফল দাঁতের মাড়ি ও গলার ঘায়ে ব্যবহৃত হয়।
- পাতা-পেট ফাঁপা, অজীর্ণ ও পেটের অন্য কোন দোষ হলে ব্যবহৃত হয়।
- ফলের শাঁস কাশি, হাঁপানি ও যক্ষ্মা রোগে উপকারী।

৮। কর্পূর



পরিচিতি: কর্পূর মসৃণ লোমযুক্ত উদ্ভিদ। কাণ্ড মোটা, নরম ও সরল। পাতা কাণ্ডের বিপরীত দিকে সরু ও অবনত। পাতার সংযোগস্থল থেকে সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণের এক একটি ফুল হয়। ফুলে বেগুনী দাগ আছে। পুষ্পদণ্ড ৩০ সে.মি. লম্বা। গাছ ১৫-২০ মিটার উঁচু, কাণ্ড নরম ও মোটা, কাণ্ডের দিকে একটির পর একটি পাতা হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল ধরে।

ব্যবহার:

- কর্পূর হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং মনে প্রফুল্লতা আনে।
- জ্বর, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ও ফুসফুসের ক্ষতনাশক।
- উদরাময়, পিত্তজনিত পাতলা পায়খানা, যকৃত রোগে এবং পিপাসা দূর করে। আমাশয়ে এ গাছ ব্যবহার হয় ।

৯। কালোজাম



পরিচিতি: কালোজাম বাংলাদেশের অন্যতম সুস্বাদু ফল। জাম গাছ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ। ৬৫ থেকে ৮০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। আমের প্রায় সমকালীন জাম পাকার সময়। গাছের কাণ্ড সরল এবং ছাল ধূসর বর্ণের মসৃণ। পাতা ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ফুল সাদা বর্ণের এবং ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ, পাকলে কালো হয়। মে ও জুন মাসে ফুল হয় এবং জুন ও জুলাই মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার:

- জামের বীজগুঁড়া দাঁতের গোড়া ও মাড়ি শক্ত করে।
- জামের বীজ পুরাতন পাতলা পায়খানা, ধাতু দুর্বলতা এবং বহুমূত্র রোগে উপকারী।
- জামের সির্কা হজমকারক ও প্লীহার রোগ নিবারক।
- জাম পাকস্থলি, প্লীহা ও লিভারের শক্তি বৃদ্ধি করে।

১০। কালোমেঘ



পরিচিতি: সরল বর্ষজীবী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। প্রায় ৩ ফুট উঁচু হয়। গাঢ় সবুজ বর্ণের পাতা ১-১ ইঞ্চি লম্বা হয় অগ্রভাগ ও বোঁটার দিকে ক্রমশ সরু। বিপরীতমুখী জেড়া জোড়া পাতার গোড়া ও মূল কাণ্ডের সংযোগস্থল থেকে সাদা বর্ণেব ছোট ছোট ফুল হয় এর সমগ্র গাছ ব্যবহার হয়। বর্ষার শেষ থেকে শীতকাল অবধি ফুল ও ফল হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে অধিক পরিমাণে জন্মে।

ব্যবহার:

- ৫ থেকে ১০ গ্রাম কালোমেঘ আধা গুঁড়া করে ২ কাপ পানিতে জ্বাল করে ১ কাপ পরিমাণ হলে তা ছেঁকে প্রতিদিন দুই বার করে খেলে জ্বর ও রক্ত আমাশয় ভালো হয়।
- খোস-পাঁচড়া হলে ১০-১৫ মিলি পাতার রস সকাল-বিকাল পানিসহ খালি পেটে খেতে হবে এবং খোস-পাঁচড়ার জায়গায় প্রলেপ দিতে হবে।
- শিশুদের কৃমি হলে ১ চা চামচ কালোমেঘ পাতার রস ও ১ চা চামচ হলুদের রস চিনিসহ ৫ থেকে ৭ দিন খেলে রোগ সেরে যায়।

১১। কুঁচিলা

পরিচিতি: কুঁচিলা বহুশাখা বিশিষ্ট ২০ থেকে ৩০ ফুট উঁচু গাছ। পাতা ২ থেকে ৪ ইঞ্চি লম্বা এবং বোঁটা ছোট। ফুল সবুজাভ সাদা বর্ণের সুগন্ধযুক্ত। ফল দেখতে গাবের মতো,

গোলাকার সবুজ বর্ণের এবং পাকলে কমলা বর্ণের হয়ে থাকে। ফলের শক্ত খোসার মধ্যে নরম সাদা বর্ণের লিচুর মতো তিতা শ্বাস আছে। প্রত্যেক ফলের মধ্যে আধা ইঞ্চি ব্যাসের ২ থেকে ৫টি বীজ থাকে। বীজগুলো বোতামের মতো উজ্জ্বল, ফিকে ও সাদা ধূসর বর্ণের পশমময় যা সহজে চূর্ণ করা যায় না। কুঁচিলা বীজ কঠিন বিষাক্ত বলে শোধন করে ব্যবহার করতে হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসে ফুল ও তৎপর ফল শীতকালে পাকে। কুঁচিলার বীজ, পাতা, কাঠ এবং মূল ও গাছের ছাল ব্যবহার হয়।



ব্যবহার:

- বীজের তেল মালিশ হিসেবে, পাতা, কাঠ, ছাল এবং মূলের নির্যাস পাউডার হিসেবে আমাশয়, অজীর্ণ ও পেটের সমস্যায় ব্যবহৃত হয়।

১২। গন্ধবাদালি

পরিচিতি: গন্ধবাদালি লতানো উদ্ভিদ। এ গাছ চেনার বিশেষ উপায় হলো এর লতা- পাতায় উৎকট গন্ধ থাকে। এজন্য এর অপর একটি নাম পুতিগন্ধ। সাধারণত অন্য গাছ অথবা বাগানের বেড়ায় দেখা যায়। পাতা-লতার সাথে বিপরীতমুখী হয়ে গজায়, আকারে ছোট পান পাতার মতো। বর্ষাকালে এর লতা ও পাতা বেশি বাড়ে।



ব্যবহার:

- গন্ধবাদালি পাতার রস মধুসহ খেলে সর্দি-কাশিতে উপকার পাওয়া যায়।
- গন্ধবাদালি পাতার বস এক সপ্তাহ নিয়মিতভাবে প্রতিদিন সকালে খেলে আমাশয়ে উপকার পাওয়া যায়।
- অজীর্ণ হলে গন্ধবাদালি পাতার ঝোল ভাতের সংগে খেলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাজীর্ণ দূর হয়।
- গন্ধবাদালি অত্যন্ত রুচিকারক।

১৩। গোলমরিচ

পরিচিতি: গোলমরিচ লতানো আংশিক পরজীবী গুলু জাতীয় উদ্ভিদ। এর শাখার গাঁটে শিকড় হয়। পাতার উপরের অংশ ঘন সবুজ। শাখার কোনটিতে পুরুষ এবং কোনটিতে স্ত্রী ফুল থাকে। ফল গোলাকার। কাঁচা অবস্থায় সবুজ, পাকলে লাল রঙের হয় এবং শুকালে কালো রঙ ধারণ করে। স্বাদ তীব্র ঝালযুক্ত এবং ঈষৎ তিতা। মে-জুন ফুল ও জুলাই-আগস্ট মাসে ফল হয়।



ব্যবহার:

▸ ছোট ছেলেমেয়েদের পেটে কৃমির ফলে পেটের উপরের অংশ ব্যথা হলে ৫০ মি.গ্রা. গোলমরিচ গুঁড়া সামান্য দুধ মিশিয়ে সকালে-বিকেলে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

▸ রক্ত চন্দন ঘষা সংগে গোলমরিচ গুঁড়া মিশিয়ে ফোঁড়ার উপর লাগানো একদিনেই তা ফেটে যাবে।

▸ বেল পাতার সংগে গোলমরিচ গুঁড়া মিশিয়ে ফোঁড়ার উপর লাগালে ফোড়া বসে যাবে।

▸ ঠাণ্ডা লেগে গলায় ব্যথা হলে এক চামচ গোলমরিচ গুঁড়ার সংগে অল্প লবণ মিশিয়ে চেটে খেলে গলা ব্যথা কমে যায়।

১৪। গাঁদা



পরিচিতি: গাঁদা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এটি ১.০ সে.মি. পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা বহু খণ্ডে বিভক্ত এবং পত্রকের ধার করাতের মতো খাঁজ কাটা। গাছে ও পাতায় সূক্ষ্ম লোম ও একটি ঝাঁঝালো গন্ধ আছে। সাধারণত: অঞ্চলভেদে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত হলুদ থেকে কমলা রঙের ফুল হয়।

ব্যবহার:

▸ কোথাও কেটে গেলে রক্ত বন্ধ করতে, সুতাকৃমি ও পেটের সমস্যায় গাঁদা ফুল উপকারী।

১৫। তেজপাতা



পরিচিতি: মাঝারি উচ্চতার উগ্র সুগন্ধিযুক্ত গাছ। পাতা ৫ থেকে ৭ ইঞ্চি লম্বা এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও তিনটি শিরাবিশিষ্ট। ডালের দু'দিকে একটির পর একটি পাতা হয়। পাতা প্রথম অবস্থায় কালো, পরিণত হলে সবুজ ও শুকালে খয়েরি রঙ ধারণ করে। বাকল পাতলা, গাঢ় খয়েরি, কোঁকড়ানো ও সুগন্ধযুক্ত। রাসায়নিক উপাদান: পাতার ইউজেনল, আইসো-ইউজেনল, ফিলাডন ও সিনাম্যালডিহাইড সমৃদ্ধ উদ্বায়ী তেল বিদ্যমান।

ব্যবহার:

▸ তেজপাতা গাছের ছাল ও পাতা বেঁটে রস খেলে অজীর্ণ এবং পেটের সমস্যা দূর হয়। যাদের গুরুপাক খাদ্য হজমে অসুবিধা হয়, তারা তেজপাতার ছালের রস খেলে উপকার পাবেন।

▸ তেজপাতার রস কোলস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

▸ এছাড়া হৃদরোগের ক্ষেত্রে তেজপাতা ওষুধ হিসাবে ব্যবহার হয়। এর রস হৃদযন্ত্রের পেশিগুলোর কার্যক্ষমতা বাড়ায়।

১৬। তেঁতুল

পরিচিতি: তেঁতুল একটি বহুল পরিচিত বিরাট আকৃতির বৃক্ষ। গাছ প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ফুট উঁচু হয় এবং বেশ মোটা হয়। পাতা ১ ইঞ্চি লম্বা দণ্ডে বাবলা পাতার মতো ছোট ছোট পাতা হয়, তবে একটু মোটা এবং ক্ষুদ্র ও সরু শাখার উভয় পাশে সারিবদ্ধ সাজান।

ফুল গুচ্ছবদ্ধ হয় এবং পাপড়ি নৌকার ন্যায় ফলটিকে ঘিরে থাকে। নিচের পাপড়ি আধা ইঞ্চি লম্বা ও নরম থাকে। বীজ চারকোণা বিশিষ্ট ১০ থেকে ১২টি হয়। বীজের শাঁস থেকে টারটারিক এসিড হয়। ৪০ কেজি ফলে ২৫ কেজি শাঁস হয়। জুলাই-আগস্ট মাসে ফুল এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফল হয়। তেঁতুল পাতা, ছাল, ফল এবং বীজ ব্যবহার হয়। তেঁতুল বাংবাদেশের সর্বত্র জন্মে।



ব্যবহার:

- কচি তেঁতুল পাতার কাথ গড়গড়া করায় মুখের ঘা, জিহ্বার ঘা, ডিপথেরিয়া ও কণ্ঠরোগে উপকারী।
- তেঁতুল পাতার কাথ সেবনে আমাশয়, অর্শ, পিত্তজ্বর ও প্রমেহ রোগে উপকারী।
- বিষাক্ত ক্ষতে তেঁতুল পাতা গোলমরিচের সঙ্গে প্রলেপ দিলে উপকারী।
- **অন্যান্য ব্যবহার:** কৃষি কাজের যন্ত্রপাতি, নৌকা ইত্যাদি তৈরিতে তেঁতুল কাঠ ব্যবহৃত হয়। তেঁতুল কাঠ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তেঁতুল বীজ বার্নিশ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। জুটমিলের মেশিনে তেঁতুল বীজ ব্যবহার হয়।

১৭। তেলাকুচা

পরিচিতি: লতাগাছ, বাগানের বেড়ায় অথবা কোন গাছকে আশ্রয় করে প্রকৃতিগতভাবে জন্মে থাকে। পাতার আকার পাঁচকোণা, ব্যাস ৪/৫ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে দেখা যায় এবং তার কিনারা করাতের ছোট দাঁতের মতো কাটা; প্রায় বারো মাসই এই লতাগাছে ফুল হয়, তবে শীতকালে বিশেষ হতে দেখা যায় না, ফল লম্বায় ১.৫/২ ইঞ্চি হয়, উপরটা মসৃণ, কাঁচা সবুজ রঙ, গায়ে সাদা ডোরা দাগ, পাকলে লাল হয়। স্বাদে তিতা। কন্দ ও বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার করে। বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলের জেলাগুলোতে প্রচুর তেলাকুচা দেখা যায়।



ব্যবহার:

- **আমাশয়:** এক চা চামচ তেলাকুচা পাতার রস চিনি মিশিয়ে খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- খোস-পাঁচড়া, ছুলি ইত্যাদি চর্মরোগে তেলাকুচা পাতার রস খেলে ও সমস্যার জায়গায় মাখলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- **রক্ত আমাশয়:** এক চা চামচ পরিমাণ তেলাকুচার পাতার রস লোহার পাত্রে গরম করে এবং আধা চামচ আখের গুড় মিশিয়ে খেলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।
- অত্যধিক গরমের ফলে মাথা ঘোরালে তেলাকুচা পাতার রস কপালে ও মাথায় মাখলে উপকার পাওয়া যায়।

১৮। তোকমা



পরিচিতি: তোকমা তুলসী জাতীয় একপ্রকার বর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড হতে বহু শাখা- প্রশাখা বের হয়। পাতার বৃন্ত দেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতির। পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে গুচ্ছবদ্ধ বহু ফুল হয়। ছোট ছোট ফল সরু, লম্বা ও মসৃণ। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়। এটি বর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ।

ব্যবহার:

- তোকমা পানিতে ভিজিয়ে পট্টি দিলে ফোড়া বসে যায় ও ফেটে যায়।
- প্রস্রাবের জ্বালা, আটকে প্রস্রাব হওয়া রোগে তোকমা ভেজা পানি ব্যবহারে বেশ উপকার হয়।
- তোকমা বীজ পানিতে ভিজিয়ে খেলে পেটের বায়ু অনেকাংশে কমে।

১৯। তুলসী



পরিচিতি: তুলসী একটি চিরহরিৎ ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদ। গণ শাখা-প্রশাখাসহ এই গাছ ২/৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতার কিনারা অনিয়মিত খাঁজকাটা ও ঢেউ খেলানো। শাখা- প্রশাখার অগ্রভাগ হতে পাঁচটি পুষ্পদণ্ড বের হয়। প্রতিটি পুষ্পদণ্ডের চারিদিকে ছাতার ন্যায় আকৃতি অনুসারে ১০-২০টি স্তরে ফুল থাকে। প্রতিটি স্তরে ৬টি করে ছোট ছোট ফুল ফোটে।

ব্যবহার:

- প্রতিদিন এক চামচ পরিমাণ তুলসী পাতার রস সকালে খেলে ম্যালেরিয়া আক্রমণে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না।
- হাম বা বসন্তের গুটি দ্রুত বের না হলে তুলসী পাতা ও আদার রস একটি ঝিনুকে একসংগে মিশিয়ে রোগীকে খাওয়ালে বসন্তের গুটি দ্রুত বের হয়ে পড়ে।
- শিশুদের সর্দিকাশি হলে এক-দুই চামচ তুলসী পাতার রস দশ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- কাশি, সর্দি ও শ্বাসকষ্টের উপশম করে।

২০। থানকুনি



পরিচিতি: থানকুনি একটি ছোট লতানো বীরুৎ প্রকৃতির উদ্ভিদ যা সাধারণত স্যাঁতসেঁতে ও আংশিক ছায়াময় পরিবেশে ভাল জন্মায়। পাতা বৃত্তাকার এবং কিনারা খাঁজ কাটা। ফুল ক্ষুদ্র এবং ঈষৎ লাল আভাযুক্ত।

ব্যবহার:

- পেটের সমস্যায় বিশেষ করে পেটের ব্যথা, পাকস্থলির রোগ, আমাশয় এবং রক্ত আমাশয়ে থানকুনি পাতা বা পাতার রস বিশেষ কার্যকরী।
- থানকুনি রক্ত পরিষ্কারক, সিফিলিস, কুষ্ঠ ও মুখের ঘায়ে উপকারী।

২১। দারুচিনি



পরিচিতি: দারুচিনি ঝোপঝাড় বিশিষ্ট মাঝারি ধরনের গাছ। অনেকটা গোলাপ জামের গাছের মতো। গাছের ছাল ধূসর বর্ণের এবং কাঠ ফিকে লাল বর্ণের এবং বেশি শক্ত নয়। পাতা প্রায় তেজপাতার মতো যা ডালের বিপরীত দিকে হয়।

ব্যবহার:

- দারুচিনি পাকস্থলির শক্তিবর্ধক, ক্ষুধাবর্ধক, বায়ু নিঃসারক ও কাঠিন্যতা সৃষ্টিকারক, উত্তেজক, বলকারক, মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের শক্তিবর্ধক।
- মসলা হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। দারুচিনি ভিজানো নির্যাস প্রতিদিন সকালে খেলে দেহের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।
- দাঁতের যন্ত্রণায় এর চূর্ণ বেশ উপকারী।

২২। নয়নতারা



পরিচিতি: নয়নতারা একটি গুল্ম জাতীয় বহু শাখা ও ঘন পাতা বিশিষ্ট উদ্ভিদ। এটি ২ থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি। বোঁটাসহ ২-৩ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। উপরিভাগ গাঢ় সবুজ থাকলেও নিচের ভাগ হালকা বর্ণের। নয়নতারার শাখা শক্ত ও কাষ্ঠল। সারা বছর ফুল ফোটে এবং ফল ধরে। সাধারণত গোলাপী, হালকা গোলাপি ও সাদা-এ তিন ধরনের নয়নতারা দেখা যায়। পুষ্পদণ্ডে পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট ফুল ফোটে। পাপড়ি চারিদিকে ছড়ানো থাকে এর নিচের দিকের রঙ হালকা। ফল দেখতে অবিকল সরিষার শুঁটির মতো, লম্বালম্বিভাবেদু'টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং প্রতি ফলে সরিষার আকারের ১৫-৩০টি পর্যন্ত বীজ থাকে। সমগ্র গাছটি তিতা স্বাদের।

ব্যবহার:

- বিষাক্ত ক্ষত ও ঘা: শরীরে কোন অঙ্গ কেটে কিংবা ঘা যদি বিষাক্ত হয়ে যায়, নয়নতারা গাছের রস প্রয়োগ করলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। রোজ একবার করে কচি ডাল ও পাতা বেটে তার রস দিয়ে ঘা ধুয়ে বেঁধে দিতে হবে। সাত দিন ব্যবহারে বিষদোষ নষ্ট হয়ে যাবে এবং ঘা শুকিয়ে যাবে।
- রক্তের চাপ বাড়লে: পাঁচ মিলিলিটার নয়নতারা গাছের মূলের টাটকা রস সকালে খালি পেটে একবার করে খেতে হবে। তিন-চার দিন খেলে উপকার পাওয়া যাবে। তবে চার-পাঁচ দিন পরে অবশ্যই রক্তের চাপ পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- বহুমূত্র রোগে: প্রতিদিন সাদা নয়নতারা গাছের দুটি পাতা খালি পেটে চিবিয়ে খেলে এ রোগ মোটেই বাড়তে পারে না।

২৩। নিম:



পরিচিতি: নিম মাঝারি ধরনের চিরহরিৎ বৃক্ষ। তবে শুষ্ক জায়গায় পত্রঝরা বৃক্ষের মতো আচরণ করে। গাছ সাধারণত ৪০-৫০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নিম গাছের পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজায়। নিম গাছের বাকল

গাঢ় ধূসর বর্ণের ও অমসৃণ। পাতা যৌগিক, ৯-১৫টি পত্রক থাকে। ফুল সাদা সুগন্ধিযুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতির। রাসায়নিক উপাদান: পাতা, ছাল, ফুল, ফল ও বিচির তেলে প্রচুর সংখ্যক তিক্ত উপাদান যেমন নিম্বিন, নিম্বিডিন, নিম্বিনিন ইত্যাদি, টার্পিনয়েড, গ্লাইকোসাইড, অ্যানকালয়েড ও ট্যানিন বিদ্যমান।

ব্যবহার:

- বমি আসতে থাকলে নিম পাতার রস ৫-৬ ফোঁটা দুধ বা পানিসহ খাওয়ালে বমি প্রশমিত হয়।
- পাতার রস একটু মধুর সাথে মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে কামলা (জণ্ডিস) রোগ ভাল হয়।
- ১ গ্রাম নিম পাতার গুঁড়া সকালে খালি পেটে পানি দিয়ে খেলে ছোট কৃমি উপশম হয়।
- নিমের ছাল ৪-৫ গ্রাম ১ কাপ গরম পানিতে রাতে ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে পেটের অজীর্ণ ভাল হয়।

২৪। বাসক



পরিচিতি: বাসক চিরসবুজ, বহু বর্ষজীবী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। বাসক গাছ ৫ থেকে ৭ ফুট উঁচু হয়। কাণ্ড সরল এবং শাখা গোলাকার। পাতা লম্বা, পাতলা ও নরম। পাতা কাণ্ডের গোঁড়া হতে বের হয়। কাণ্ড গাঁটযুক্ত। ফুল সাদা, তবে মাঝে মধ্যে লাল ছিটযুক্ত দাগ থাকে। মে-জুন মাসে ফুল ও জুলাই-আগস্ট মাসে ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফলে প্রচুর পরিমাণ ট্যানিন, স্টেরল, ম্যানিউল ও অন্যান্য চিনি বিদ্যমান। বাসক বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।

ব্যবহার:

- পাতাসিদ্ধ পানি পান করলে বসন্ত সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।
- কাশির জন্য বাসক অত্যন্ত ফলপ্রদ।
- মিশ্রী ও গোলমরিচের সাথে বাসক পাতার রস অথবা বাসকসিদ্ধ পানি মিশিয়ে পান করলে সব ধরনের কাশি ভালো হয়।

২৫। ভৃঙ্গরাজ



পরিচিতি: ভৃঙ্গরাজ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ছোট গুল জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ৬ থেকে ৯ ইঞ্চি লম্বা হয়। কাণ্ডের নিচের গাঁটে শিকড় হয় এবং পাতা ১ থেকে ২ ইঞ্চি লম্বাকৃতি যার অগ্রভাগ সরু এবং কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়, দু'দিকে সাদা বর্ণের লোমযুক্ত। গাছের অগ্রভাগে এক একটি পীতবর্ণের ফুল হয়। ফুলের পাপড়ি কর্তিত ও লোমযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও শরৎকালে ফুল হয়। আমাদের দেশে চার প্রজতির ভৃঙ্গরাজ দেখা যায় একটির ফুল হলুদ, অপরটির ফুল নীল, অন্যটির সাদা এবং একটির ডাট! একটু কালচে।

ব্যবহার:

▸ ভৃঙ্গরাজ পাতার রস দ্বারা কুলি করলে দাতের ব্যথা ও মুখের রোগ দূর হয় এবং চোখে দিলে চোখ ওঠা নিবারণ হয়।

▸ পাতা বাটা প্রলেপ দিলে সকল প্রকার দাঁদ ও চর্মরোগে উপকার পাওয়া যায়। কালো ভৃঙ্গরাজ রস পান করলে এবং মাথায় ব্যবহার করলে চুল কালো হয় এবং পাতার রস মাথায় মাখলে উকুন মরে যায়।

▸ পাতার রস ১৫ গ্রাম সমান লবণসহ খেলে তৎক্ষণাৎ শূলের বাহা ও পেটের বাথা দূর হয় এবং পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পায়।

▸ সূর্যোদয়ের পরে অনেকের মাথা ব্যথা হয় (শিরোরোগ) আধকপালে ব্যথা হয় (সাইনোসইটিস); সেক্ষেত্রে ভৃঙ্গরাজের পাতা গুঁড়ার নস্য নিলে বা পাতার রস মাথায় মাখলে উপশম হয়।

উপসংহার:

বিশ্বে এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি, অরগানিকসহ নানা ধরনের চিকিৎসা প্রচলিত। আকস্মিক অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা ঘটে গেলে যেখান থেকে চিকিৎসকের নিকটে বা হাসপাতালে তাৎক্ষণিক পৌঁছানো না গেলে হাতের নাগালের মধ্যে কোন ঔষধি উদ্ভিদ পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যেতে পারে। তবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নির্দিষ্ট কোন রোগের ক্ষেত্রে ঔষধি উদ্ভিদ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

তথ্যসূত্র:

১। Thousand Plants of Bangladesh, Volume 1and 2, Bangladesh Forest Research Institute, Chattogram, Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

২। শ্যামলী রমনা, সৌরভ মাহমুদ।

৩। আমাদের গাছপালা, কৃষিবিদ শফিউল ইসলাম।

৪। গাছপালার ছবি (গুগল)

লেখক:
মুনীরা সুলতানা এনডিসি
মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।

প্রাণিজগতে রক্তের রং

ড. মো. নিয়ামুল নাসের

ভূমিকা

প্রাণিজগতে রক্ত এক অপরিহার্য তরল যোজক কলা, যা প্রাণীর জীবনচারণ নিশ্চিত করে। শারীরবৃত্তিক কাজে রক্ত শরীরের গ্যাস, পুষ্টি, বর্জ্য, হরমোন ও রোগ প্রতিরোধী কোষ পরিবহন করে। মানুষসহ অধিকাংশ মেরুদন্ডী প্রাণীর রক্ত লাল রঙের হলেও প্রাণিজগতে রক্তের বর্ণের ভিন্নতা এমনকি বর্ণহীন হতে দেখা যায়। এর মূল কারণ রক্তে বিদ্যমান এক রঞ্জক পদার্থ (Pigments)। রক্তের রঙের বৈচিত্র্য প্রাণীর শারীরবৃত্ত ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চমৎকার দৃষ্টান্ত।

রক্তের কাজ

শ্বাসক্রিয়ায় অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহণ রক্তের প্রধান কাজ। এছাড়াও শরীরের পুষ্টিতে যেমন, গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, লিপিড, ভিটামিন বহন। রক্তের মাধ্যমে শরীরের বর্জ্য নিষ্কাশনে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি অপসারণ করে। হোমিওস্টেসিস, অর্থাৎ শরীরের pH, তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার পরিবর্তনের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করাও রক্তের কাজ। দেহের রোগ প্রতিরোধে প্রতিরক্ষা কোষ ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পদার্থ বহন এবং শারীরবৃত্তিক যোগাযোগে হরমোন ও সংকেতবাহী অণুগুলো রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়।

রক্তের গঠন

রক্তের রং যাই হোক না কেন, মূল উপাদানগুলি প্রায় একই। অমেরুদন্ডী প্রাণীর রক্তের জলজ অংশকে হিমোলিম্ফ, এবং মেরুদন্ডী প্রাণীদের রক্তরস বা প্লাজমা বলে। এতে মূলত পানি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আয়ন, পেপ্টাইড, প্রোটিন, লিপিড, হরমন, বিপাকীয় পদার্থ, ইত্যাদি পাওয়া যায়। রক্তের কোষ উপাদানগুলোকে সামগ্রিকভাবে রক্ত কর্পাস্কল (Blood corpuscles) বলা হয়। এগুলোর মধ্যে লাল রক্তকণিকা বা ইরিথ্রোসাইট (RBC), সাদা রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট (WBC) এবং প্লেটলেট বা থ্রম্বোসাইট কোষ রয়েছে। এ তিনটি উপাদানই মূলত অস্থিমজ্জায় হেমাটোপোয়েসিস প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। সাদা রক্তকণিকা দেহের ইমিউন প্রতিরক্ষায় নিউক্লিয়াসযুক্ত নিউট্রোফিল, লিম্ফোসাইট, মোনোসাইট, ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল হিসেবে থাকে। প্লেটলেট আসলে পূর্ণাঙ্গ কোষ নয়; হেমোস্টেসিসের মূল চালিকাশক্তি এবং রক্ত জমাট বাঁধার (Aggregation; GPIIB/IIIA-ফাইব্রিনোজেন) কাজ করে থাকে। রক্ত কোষ বা কণিকা গুলির মধ্যে শ্বাস-রঞ্জক পদার্থ রক্তের রঙ নির্ধারণের মূল উপাদান। মেরুদন্ডী প্রাণীর এরিথ্রোসাইট (লাল রক্তকণিকা)-এর মধ্যে শ্বাস-রঞ্জক পদার্থ থাকে।

রক্তের রঙভিত্তিক বৈচিত্র্য

ক. হিমোগ্লোবিন যুক্ত রক্ত যখন ধমনীতে অক্সিজেনযুক্ত থাকে তখন উজ্জ্বল লাল এবং শিরায় অক্সিজেনবিহীন হলে গাঢ় লাল বর্ণের হয়। রক্তে পরফাইরিন কমপ্লেক্স হিম ও গ্লোবিন প্রোটিন সহযোগে অক্সিজেন রহন করে। তবে আয়রন (Fe^{2+})-ভিত্তিক প্রোটিন হওয়ায় রক্ত লাল রং হয়। অধিকাংশ মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের রক্ত লাল। শারীরবৃত্তীয়ভাবে, Fe^{2+} দ্বারা অক্সিজেন সংগ্রহ করে সারা দেহে পরিবহন করতে সক্ষম।

খ. হিমোসায়ানিন রক্তের রং নীল। হিমোসায়ানিন রক্তে তামা (Cu^{2+})-ভিত্তিক প্রোটিন প্লাজমায় দ্রবীভূত থাকে। তখন রক্ত অক্সিজেনযুক্ত হলে নীল রং ধারণ করে। আবার অক্সিজেনহীন হলে রক্ত বর্ণহীন হয়। শিতল কিংবা অক্সিজেনস্বল্প পরিবেশে বসবাসকারী শামুক, অক্টোপাস, স্কুইড, কাঁকড়া, লবস্টার, ইত্যাদি উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়।

গ. ক্লোরোক্রুয়ারিন যুক্ত প্রাণীর রক্তের রং সবুজ। এতে রঞ্জক হিসেবে হিমোগ্লোবিনের মতো আয়রন (Fe^{2+})-ভিত্তিক প্রোটিন থাকলেও ভিন্ন পার্শ্বশৃঙ্খলে যুক্ত হয়ে যৌগ সৃষ্টি করে। কিছু সামুদ্রিক ওয়ার্ম Serpulidae, Sabellidae পরিবারের প্রাণীদের রক্ত রং পাতলা হলে সবুজ; ঘন হলে লালচে দেখায়। ধারনা করা হয় যে, শারীরবৃত্তীয়ভাবে অক্সিজেনস্বল্প সামুদ্রিক পরিবেশে এই প্রাণিরা এভাবে অভিযোজিত হয়েছে।

ঘ. বেগুনি বা গোলাপি রং রক্তের প্রাণীদের হিমেরিথ্রিন নামক রঞ্জক পদার্থ দেখা যায়। এরা লোহাযুক্ত প্রোটিন তবে হিম গ্রুপ নেই। রক্ত অক্সিজেনযুক্ত হলে বেগুনি বা গোলাপি রং হয়, তবে অক্সিজেনহীন হলে বর্ণহীন হয়। উদাহরণস্বরূপ সামুদ্রিক সিপুনকুলিড ওয়ার্ম এবং ব্র্যাকিওপড প্রাণী, শারীরবৃত্তীয়ভাবে অক্সিজেন সরাসরি রক্তের লোহার সাথে বাঁধা থাকে।

উ. ভ্যানাডিন-যুক্ত রঞ্জক রক্তের রং সবুজ, নীল বা হলুদ হয়। ভ্যানাডিয়াম-বাইন্ডিং প্রোটিন সমুদ্রের সি-স্কোয়ার্ট (Ascidians) দেখা যায়। রক্তে এই রঞ্জক যৌগের শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা তেমন জানা নেই। সম্ভবত অক্সিজেন সঞ্চালনে ভ্যানাডিয়াম-বাইন্ডিং প্রোটিন জড়িত।

চ. বর্ণহীন রক্তে রঞ্জক পদার্থ অনুপস্থিত। রক্ত রং স্বচ্ছ যা অ্যান্টার্কটিকার আইসফিশ বা চিংড়িতে দেখা যায়। শারীরবৃত্তীয়ভাবে ঠান্ডা ও অক্সিজেনসমৃদ্ধ পানিতে সরাসরি প্লাজমায় অক্সিজেন দ্রবীভূত হয়।

বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ: রক্তের আরও গুনাবলী

রক্তে বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ আছে, যা বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্নভাবে কাজ করে। সমুদ্রের হর্স-সু-ক্র্যাব প্রাণীর রক্ত প্রধানত: সহজাত প্রতিরক্ষা কাজে অবদান রাখে। হেমোসাইট (রক্তকোষ) ও হেমোলিম্ফ প্লাজমা থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরক্ষা-মূলক অণু করে। যেমন, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড (AMPs) যেমন Tachyplesin, Polyphemusin), লেকটিন (Tachylectin), হেমোসায়ানিন-উদ্ভূত পিপটাইড, রক্ত জমাট বাঁধার প্রোটিয়েজ (Factor C, Factor B) যা LAL প্রতিক্রিয়ার (Endotoxin sensing) মূল ভুমিকা রাখে। মানব চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রাণীর বিভিন্ন বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ আজ গবেষকদের আগ্রহ জাগিয়েছে।

রক্তের শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন ও বিবর্তনীয় গুরুত্ব তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

- **অক্সিজেনের প্রাপ্যতা:** কম অক্সিজেন পরিবেশে বিকল্প রঞ্জক যেমন হিমোসায়ানিন কাজ করে থাকে।
- **তাপমাত্রা ও সান্দ্রতা:** ঠান্ডা পরিবেশে বৃহৎ প্রোটিনগুলি অভিযোজনে ভূমিকা রাখে।
- **রক্তসঞ্চালন পদ্ধতি:** খোলা ও বন্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র অনুসারে রক্তে ভিন্ন ভিন্ন রঞ্জক পদার্থ কার্যকর ভূমিকা রাখে। এবং
- **দ্বৈত ভূমিকা:** অনেক রঞ্জক-যৌগ যেমন, হিমোসায়ানিন, হিমেরিথ্রিন, অক্সিজেন পরিবহনের পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

উপসংহার

অভিযোজনের এক অপূর্ব উদাহরণ হলো প্রাণীদের রক্তের রং। অধিকাংশ মেরুদন্ডী প্রাণীদের রক্ত লাল হলেও কিছু অমেরুদন্ডী প্রাণীর মাঝে চমকপ্রদ বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রাণীর রক্তে কোনো রং না থাকা, প্রমাণ করে জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা কিভাবে ভিন্ন পরিবেশ ও শরীরের চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যা আজও অনেক গবেষণার সুযোগ রাখে।

রক্তের রং	রক্তের রঞ্জক	উদাহরণ
লাল	হিমোগ্লোবিন	মানুষ, হাতি, টুনা মাছ, ব্যাঙ।
নীল	হিমোসায়ানিন	হর্সশু ক্র্যাব, লবস্টার, অক্টোপাস।
সবুজ	ক্লোরোক্রুয়ারিন	কিছু পলিকীট ওয়ার্ম (Eisenia foetida)।
বেগুনি	হিমেরিথ্রিন	পিনাট ওয়ার্ম (Sipunculus nudus), ব্র্যাকিওপড।
হলুদ-সবুজ	ভ্যানাডিয়াম-বাইন্ডিং প্রোটিন	সি স্কোয়ার্ট
বর্ণহীন	রঞ্জক অনুপস্থিত	অ্যান্টার্কটিক আইসফিশ, চিংড়ি

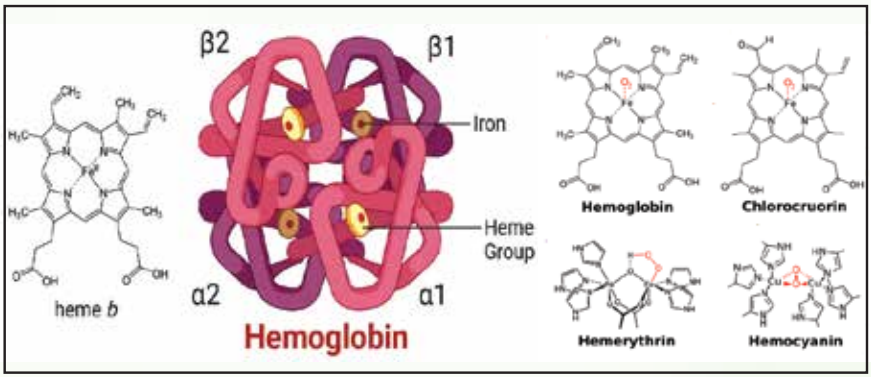

হিমোগ্লোবিন (বামে) এবং অন্যান্য রঞ্জক পদার্থের রাসায়নিক গঠন ও অক্সিজেন বন্ধনের তুলনা চিত্র (ডানে)



সামুদ্রীক কাছিমের লাল রঙের রক্ত



হর্স-সু-ক্র্যাবের নীল রঙের রক্ত



পলিকীট ওয়ার্মের রক্ত সবুজ রঙের



পলিকীট ওয়ার্মের রক্ত সবুজ রঙের



সি স্কোয়ার্ট রক্ত হলুদ-সবুজ রঙের



চিংড়ির রক্ত বর্ণহীন





গবেষণাগারে হর্স-সু-ক্র্যাব থেকে নীল-রক্ত সংগ্রহ করা হয়

চিত্র সূত্রঃ বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে।

লেখক:
ড. মো. নিয়ামুল নাসের
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মাইক্রোগ্রিন: সুপারফুড পটেনশিয়ালসহ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ
(Microgreen: A Tiny Plant with Superfood Potential)

সুকল্যান বাছাড়

১. ভূমিকা (Introduction):

মাইক্রোগ্রিন হল এক ধরনের উদ্ভিদ যা অঙ্কুরিত ও শিশু সবুজের মধ্যে পড়ে। এরা অনেক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুবিধা দিতে সক্ষম। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে তথা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।

১৯৮০-এর দশকে ক্যালিফোর্নিয়ান রেস্তোরাঁর দৃশ্যে তাদের পরিচয়ের পর থেকে, মাইক্রোগ্রিনগুলি ক্রমাগত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই সুগন্ধযুক্ত সবুজ শাক, যা মাইক্রো ভেষজ বা উদ্ভিজ্জ কনফেটি নামেও পরিচিত, স্বাদে সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন ধরনের খাবারে রঙের একটি স্বাগত স্প্ল্যাশ যোগ করে। তাদের আকার ছোট হওয়া সত্ত্বেও, এরা পুষ্টিকর পাঞ্চ প্যাক করে থাকে, প্রায়শই অধিক পরিপক্ক শাকসবজির তুলনায় উচ্চতর পুষ্টির মাত্রা ধারণ করে। এটি তাদের যে কোনও ডায়েটে একটি ভাল সংযোজন করে তোলে।

মাইক্রোগ্রিন হলো ক্ষুদ্রাকার সবজি যা অল্প সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পায় এবং প্রধানত ৭ থেকে ২১ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়। এগুলো সাধারণত মূল গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে সংগ্রহ করা হয়, যা অঙ্কুরিত বীজ থেকে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন গবেষণায় মাইক্রোগ্রিনের পুষ্টিগুণের কারণে এগুলো সুপারফুড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সারা বিশ্বে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য সচেতন জনগণের মধ্যে মাইক্রোগ্রিনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

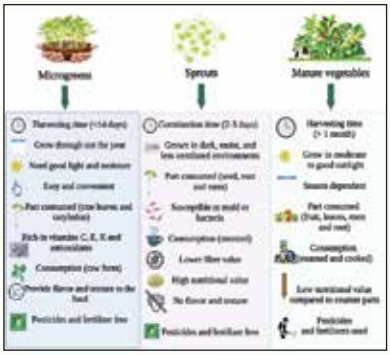

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য: এই প্রবন্ধে মাইক্রোগ্রিনের গুরুত্ব, তাদের পুষ্টিগুণ, চাষাবাদ পদ্ধতি, স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য: এই প্রবন্ধে মাইক্রোগ্রিনের গুরুত্ব, তাদের পুষ্টিগুণ, চাষাবাদ পদ্ধতি, স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

২. বোটানিকাল শ্রেণীবিভাগ ও প্রকারভেদ (Botanical Classification and Types of Microgreens):

মাইক্রোগ্রিন বিভিন্ন উদ্ভিদ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং এই উদ্ভিদগুলির শ্রেণীবিভাগ করা যায় নিম্নরূপ :

- **ব্রাসিকেসি (Brassicaceae)** বা সরিষা পরিবারের উদ্ভিদ:
- **রাডিশ (Raphanus satiuvs):** এর গায়ে শক্ত, তীব্র স্বাদ এবং এতে ভিটামিন সি ও ফাইবার রয়েছে।
- **ব্রোকলি (Brassica oleracea):** এটির অ্যান্টি-ক্যান্সার বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
- এশিয়ান সবজি:
- **ধনে (Coriandrum satiuvm):** এর পাতায় প্রচুর ভিটামিন কে এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে।

- **মেথি (Trigonella foenum-graecum):** ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
- **ব্রাসিকেসি (Brassicaceae) বা সরিষা পরিবারের উদ্ভিদ:**
- **সরিষা (Brassica juncea):** এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

পুষ্টির ঘনত্ব: মাইক্রোগ্রিনের মধ্যে খাদ্য পুষ্টির ঘনত্ব সাধারণ সবজির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। উদাহরণস্বরূপ, কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাইক্রোগ্রিনে ক্যালসিয়াম, আয়রন, এবং অন্যান্য খনিজের পরিমাণ সাধারণ সবজির তুলনায় ৪০-৫০ গুণ বেশি।

৩. মাইক্রোগ্রিনের পুষ্টিগুণ (Nutritional Value of Microgreens):

খনিজের ঘনত্ব সাধারণ সবজির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (ক্ষেত্রবিশেষে ৪০ গুণ পর্যন্ত)। এর মধ্যে রয়েছে:

- **ভিটামিনের ঘনত্ব:**
- **ভিটামিন সি:** মাইক্রোগ্রিনে ভিটামিন সি-এর ঘনত্ব প্রাপ্তবয়স্কদের দৈনিক চাহিদার ২৫%-৫০% পূরণ করতে পারে।
- **ভিটামিন কে:** হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং মাইক্রোগ্রিনে এর উপস্থিতি লক্ষণীয়।
- **মাইক্রোমিনারেল:**
- মাইক্রোগ্রিনে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়ামের ঘনত্ব উল্লেখযোগ্য।
- উদাহরণস্বরূপ, ব্রোকলি মাইক্রোগ্রিন-এ আয়রনের পরিমাণ প্রাপ্তবয়স্কদের দৈনিক প্রয়োজনের ২০% পূরণ করে।
- **মেথি মাইক্রোগ্রিন:** ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
- **অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট:**
- মাইক্রোগ্রিনগুলির মধ্যে পলিফেনল এবং ক্যারোটিনয়েডসের মত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান রয়েছে, যা কোষের ক্ষতি রোধে সাহায্য করে।
- এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ব্রোকলি এবং কারিজাতীয় পরিবারের মাইক্রোগ্রিনগুলিতে উচ্চ মাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়।
- **গবেষণা উদাহরণ:** ব্রোকলি মাইক্রোগ্রিন-এ প্রায় ১০ গুণ বেশি সালফোরাফেন পাওয়া যায়, যা ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

৪. চাষাবাদ পদ্ধতি (Cultivation Techniques):

মাইক্রোগ্রিনের চাষের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি রয়েছে:

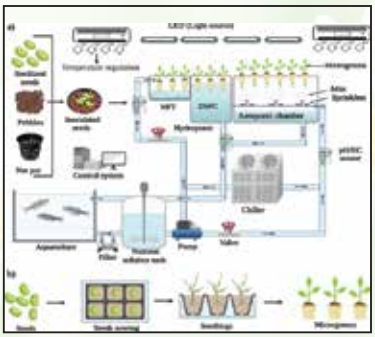

- **মাটিতে চাষ:** উর্বর মাটি প্রয়োজন এবং সঠিক জলাবদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। মাটির pH ৬.০ - ৭.৫ হওয়া উচিত। বীজ বপনের পর, সেগুলোর অঙ্কুরোদগমের জন্য ১-২ সপ্তাহ সময় লাগে।

▸ **হাইড্রোপনিক চাষ:** এতে মাটি ছাড়াই পানি ব্যবহার করা হয় এবং হালকা পুষ্টির সমাধান প্রদান করা হয়। এটি দ্রুত বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বাড়ায়, এবং এটার জন্য খরচ কম হয়।

▸ **আলো এবং তাপমাত্রা:**

▸ মাইক্রোগ্রিনের জন্য ১২ - ১৬ ঘণ্টা আলো দরকার, যা সাধারণত এলইডি বা ফ্লুরোসেন্ট আলো দ্বারা সরবরাহ করা যায়।

▸ তাপমাত্রা ১৮-২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখতে হবে।

▸ **বৈজ্ঞানিক গবেষণা:** গবেষণায় দেখা গেছে যে, আলো এবং তাপমাত্রার সঠিক সংমিশ্রণ মাইক্রোগ্রিনের স্বাদ এবং পুষ্টির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

৫. মাইক্রোগ্রীন রন্ধন শিল্পে ভূমিকা (Microgreens in Culinary Arts):

মাইক্রোগ্রিন শুধুমাত্র পুষ্টি নয়, বরং রান্নার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এগুলো বিভিন্ন খাবারের স্বাদ এবং উপস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করে।

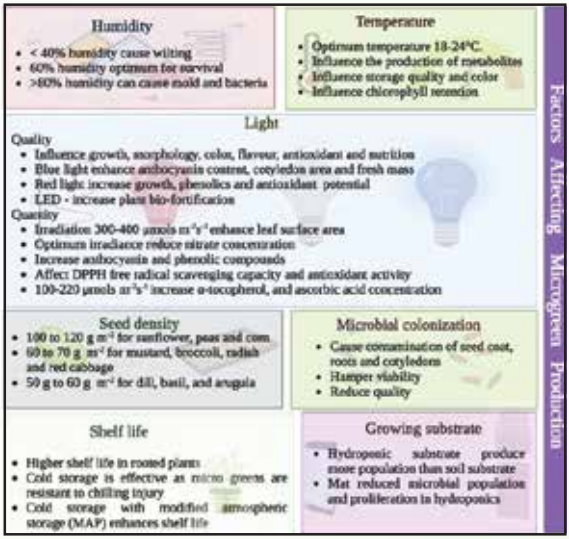

উদাহরণস্বরূপ:

▸ **সালাদ:** বিভিন্ন মাইক্রোগ্রিন ব্যবহার করে স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু সালাদ প্রস্তুত করা যায় (যেমন, রাডিশ এবং ব্রোকলি মাইক্রোগ্রিন)।

▸ **স্যান্ডউইচ:** স্যান্ডউইচে মাইক্রোগ্রিনের সংযোজন স্বাদ বাড়ায় এবং পুষ্টিগুণ যোগ করে (যেমন, জিরা মাইক্রোগ্রিন)।

▸ **স্যুপ:** স্যুপে মাইক্রোগ্রিন যুক্ত করলে তা স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে এবং স্বাদ বাড়ায় ।

▸ **গবেষণা উদাহরণ:** গবেষণায় দেখা গেছে যে, খাদ্য প্রস্তুতিতে মাইক্রোগ্রিনের ব্যবহারে খাদ্যের পুষ্টিগত মান বৃদ্ধি পায় এবং এটি ভিজ্যুয়াল অ্যাপিলকেও উন্নত করে।

৬. স্বাস্থ্য উপকারিতা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা (Health Benefits and Scientific Studies):

মাইক্রোগ্রিনের স্বাস্থ্য উপকারিতা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা চলছে। **যেমন:**

▸ **অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভূমিকা:** মাইক্রোগ্রিনে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস দেহের কোষগুলিকে মুক্ত র‍্যাডিকেলসের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। এটি ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাইক্রোগ্রিনের নিয়মিত ব্যবহার হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

▸ **ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ:** মেথি মাইক্রোগ্রিন ইনসুলিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

▸ গর্ভাবস্থায় পুষ্টির চাহিদা: গর্ভবতী নারীদের জন্য মাইক্রোগ্রিনে ফোলেটের উপস্থিতি তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়ক। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ফোলেট গর্ভাবস্থায় সঠিক নিউরাল টিউব ডেভেলপমেন্টে সহায়ক।

৭. অর্থনৈতিক দিক (Economic Aspects):

মাইক্রোগ্রিনের চাষ কৃষকদের জন্য একটি লাভজনক উদ্যোগ হয়ে উঠেছে। কারণ:

▸ **বাজার প্রবণতা:** ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় মাইক্রোগ্রিনের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০ সালে, মাইক্রোগ্রিনের বাজারের আকার প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ভবিষ্যতে এর বৃদ্ধির আশা ১২%।

▸ **নগর কৃষি:** শহর অঞ্চলে ছোট পরিসরে মাইক্রোগ্রিনের চাষ সহজ এবং লাভজনক। এটি স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করতে পারে, যা পরিবহন খরচ কমায়।

▸ **লাভজনক চাষ:** একটি ছোট এলাকায় মাইক্রোগ্রিন চাষ করে কৃষকরা অধিক লাভ করতে পারে, যা খাদ্য নিরাপত্তার জন্যও সহায়ক।

▸ **গবেষণা উদাহরণ:** একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাইক্রোগ্রিন চাষ কৃষকদের জন্য ন্যূনতম বিনিয়োগে অধিক লাভ অর্জনের সুযোগ তৈরি করে।

৮. চ্যালেঞ্জ এবং সীমাবদ্ধতা (Challenges and Limitations):

মাইক্রোগ্রিনের চাষে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

▸ **পরিবেশগত সমস্যা:** জল ও মাটির মান বজায় রাখতে হবে, যা প্রায়ই একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জল সরবরাহ সংকট হতে পারে।

▸ **স্বাস্থ্যগত উদ্বেগ:** কিছু মাইক্রোগ্রিনে বিষাক্ত পদার্থ যেমন সালফাইট হতে পারে, যা খেতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এর মধ্যে প্রচুর গঠনগত সমস্যা যেমন প্যাথোজেনের সংক্রমণ ও ফাঙ্গাল বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে।

▸ **গবেষণা উদাহরণ:** গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাইক্রোগ্রিনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমানোর জন্য সঠিক চাষ পদ্ধতি প্রয়োজন।

৯. মাইক্রোগ্রিন গবেষণার ভবিষ্যৎ প্রবণতা (Future Trends in Microgreen Research):

মাইক্রোগ্রিনের গবেষণা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে :

▸ **নতুন চাষের পদ্ধতি:** হাইড্রোপনিক এবং এয়ারোপনিক পদ্ধতিতে গবেষণা বাড়ছে, যা দ্রুত উৎপাদনের সম্ভাবনা তৈরি করছে। এই প্রযুক্তিগুলি উন্নত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

▸ **জিনগত গবেষণা:** নতুন জাতের মাইক্রোগ্রিন তৈরিতে গবেষণা চলছে, যা পুষ্টির ঘনত্ব বাড়াতে সহায়ক হতে পারে। এন্টি-অক্সিডেন্ট স্তর বাড়ানোর জন্য জিনগত প্রকৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

▸ **সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** মাইক্রোগ্রিনের চাষ স্থানীয় কৃষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করতে পারে এবং খাবারের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

১০. উপসংহার (Conclusion):

মাইক্রোগ্রিন খাদ্য এবং কৃষির ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবের সূচনা করেছে। তাদের পুষ্টিগুণ, স্বাদ, এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কারণে এগুলো বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সঠিক চাষ পদ্ধতি ও গবেষণার মাধ্যমে মাইক্রোগ্রিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব, যা আগামীতে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র (References):

- Ghafoor, K., & Barrow, C. J. (2018). Nutritional and Health Benefits of Microgreens. Journal of Functional Foods, 45, 304-311.
- Kozlowski, M., & Emek, Y. (2021). Cultivation and Yield of Microgreens. Horticulture Research, 8(1), 101.
- Gil, M. I., et al. (2019). Role of Microgreens in Culinary Arts. Journal of Culinary Science & Technology, 17(1), 37-54.
- Matz, A., & Reiter, S. (2020). Health Benefits of Microgreens. Nutrition Reviews, 78(2), 102-110.
- Patel, S., & Desai, S. (2021). Economic Viability of Microgreens. Journal of Agricultural Economics, 72(1), 210-220.
- Baker, J. R., & Wong, D. (2022). Microgreens: Challenges in Production. Agronomy Journal, 114(4), 1735-1745.
- Chung, M. Y., et al. (2017). Folates and Their Role in Pregnancy. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 37(2), 161-166.
- Mahinder Partap, Diksha Sharma, Deekshith HN, Meenakshi Thakur, Vipasha Verma, Ujala, Bhavya Bhargava (August, 2023). Microgreen: A tiny plant with superfood Potential. Journal of Functional Foods Vol. (127). CSIR, India.

লেখক:
সুকল্যান বাছাড়
সিনিয়র কিউরেটর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, ঢাকা।

পলিথিনের অপব্যবহার রুখতে হবে

মো: সিরাজুল ইসলাম

দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা আর অসতর্কতাবশত প্রায়ই আমরা পরিবেশকে নোংরা, অস্বাস্থ্যকর করে তুলছি। ইচ্ছা হলেই পানি পান করে বোতল ফেলে যাচ্ছি রাস্তায়। খালি হাতে বাজারে গিয়ে দোকানে গিয়ে বিনামূল্যের পলিথিন ব্যাগে ভর্তি বাজারের কেনাকাটা করে ফিরে আসি। তারপর সেই ব্যাগ স্থান করে নেয় আবর্জনার স্তূপে, নর্দমায়, কিংবা রাস্তার ধারে। এতে করে দূষিত হচ্ছে ঐ এলাকার বায়ু, মাটি ও পানি। হরহামেশাই চিপস, চকলেট চুইংগামের মোড়ক এখানে সেখানে ফেলে দিই আমরা। ফেলে দেয়ার পর সেই মোড়কটির কী হলো কোথায় গেল, কিংবা মোড়কটি কিসের তৈরি কিছুই ভেবে দেখিনা। অনেকেই স্কুলগামী শিশুকে প্লাস্টিকের সুদৃশ্য বোতল বা কন্টেইনারে পানি দিচ্ছেন। যে মানুষ তাঁর সন্তানকে ভালো রাখার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করছেন, সেই তিনিই রাস্তায়, জলাশয়ে প্লাস্টিক ফেলে বিষাক্ত করে তুলছেন পরিবেশকে। এভাবে আমাদের দেশে পলিথিনের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে বাজারের ব্যাগ, খাবারের মোড়ক বা আরো অনেক কিছুতে। আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে খাদ্য পরিবহন, সংরক্ষণ থেকে শুরু করে পরিবেশের পুরোটা জুড়েই আধিপত্য প্লাস্টিকের।

ঘরে বাইরে এখন প্লাস্টিকের পেট বোতলের ছড়াছড়ি। খাবার রাখা থেকে পানি রাখা, সব কিছুতেই এই প্লাস্টিক বোতল। পড়ে গেলে চট করে ফেটে যায় না। বোতল পরিষ্কার করাও সোজা। ব্যবহারের এমন সোজা-সাপ্টা সুবিধায় প্লাস্টিকের বোতলের চল বাড়তে বাড়তে এখন জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের চারপাশে হাজারো রকমের প্লাষ্টিক বা পলিথিনের তৈরি জিনিস দেখতে পাই,যেগুলো আমরা ব্যবহার করি। বৈদ্যুতিক সুইচ, টেলিফোন, টেলিভিশন সেট, লাপটপ, কম্পিউটার, দাঁতের ব্রাশ, প্লাষ্টিকের হাড়িকুড়ি, বালতি বোতল, পাইপ, পোশাক-আশাক, গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং আরো নানা জিনিস পলিথিন বা প্লাষ্টিকের তৈরি।

প্লাস্টিক কী?

'প্লাস্টিক' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'প্লাস্টিকস' থেকে যার অর্থ স্বচ্ছন্দে যে কোন আঁকার দেয়া যায় এমন কিছু। ১৮৪৫ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার পার্কিস নাইট্রো-সেলুলোজ, প্লাস্টিসাইজার ও অন্যান্য দ্রাবক পদার্থের মিশ্রণে তৈরি করেন আজকের এই প্লাস্টিক। প্লাস্টিক মূলত কার্বন যৌগের একটি চলমান শিকলের জটিল গঠন, যার মূল উপাদানে রয়েছে কার্বনের সাথে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং সালফারের জটিল রাসায়নিক বন্ধন। সহজ কথায় প্লাষ্টিক বলতে বুঝায় এমন বস্তুকে যা যে কোন ছাঁচে তৈরি করা যায়। আর পলিথিন বলে আমরা যাকে জানি, তাও প্লাস্টিকের একটি ধরন। এটি শক্ত ও নমনীয় এবং এটি সহজেই গ্যাসীয় বা তরল বস্তুকে বাধা দিতে পারে।

পলিথিনের উদ্ভব হলো কীভাবে?

প্লাস্টিক বা পলিথিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় গ্যাস আর তরল বস্তু। এই গ্যাস আর তরল বস্তু আসে কয়লা ও অপরিশোধিত তেল থেকে। খনিজ তেল থেকে যে বস্তুটি পাওয়া যায়,

তাতে থাকে অনেক ক্ষুদ্র পরমাণু। তাপ আর চাপের ফলে এগুলো জোড়া লেগে তৈরি করে এক একটি অণুর বিশাল শিকল বা চেইন। সহজ কথায়, ইথিলিনের দুই বা ততোধিক পরমাণুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংযোজিত অপেক্ষাকৃত বড় অণুবিশিষ্ট নতুন নতুন যৌগিক পদার্থ। এগুলোকেই বলে পলিমার। এই পলিমার বেঁকে যেতে পারে বলেই পলিমার থেকে তৈরি হয় পলিথিন বা প্লাস্টিক নামের বিচিত্র সব জিনিসপত্র। অস্বীকার করা যাবে না, প্লাস্টিক আমাদের হাজারো কাজে লাগছে। কিন্তু সেই হাজারো কাজের মাঝেই প্লাস্টিক বা পলিথিন আমাদের বড় ক্ষতির কারণও হচ্ছে। এ ক্ষতি হচ্ছে মূলত অপব্যবহারের কারণে। প্লাষ্টিক পানি ও বিদ্যুৎ-রোধী। যে কোন রঙের নমনীয় ও স্বচ্ছ জিনিস এ থেকে তৈরি করা যায়। এগুলোকে যেমন খুশি বাঁকানো যায়। প্লাস্টিক, পলিথিনের বড় গুণগুলোই তার অপব্যবহারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহজে পচে না বা নষ্ট হয়ে যায় না বলে এখন এগুলো পরিবেশের জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পলিথিন কী কী ক্ষতি করছে?

১. পলিথিন মাটি দূষণ করে। মাটি জীবনকে ধারণ, লালন ও বিকশিত করে। পলিথিন মাটিতে সূর্যের আলো,পানি ও বাতাস প্রবেশে বাধা প্রদান করে মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয়। ফলে ফসল উৎপাদন কমে যায়। ২. পলিথিন পুকুর, নদীও সমুদ্রের তলদেশে জমা হয়ে মাছের প্রজনন, খাদ্য ও অক্সিজেন সংকটের সৃষ্টি করে। ফলে নদী ও সাগরের জীবজগৎও দারুণ হুমকীর মুখে পড়ছে। ৩. পলিথিন মাটির উপর আস্তরণ সৃষ্টি করছে। ড্রেন ও নর্দমাতে পড়ে পানি সরবরাহ বন্ধ করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। ৪. পলিথিন ক্যান্সার, চর্মরোগ, শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে। ৫. পলিথিন মিশ্রিত মাটিতে নির্মিত ভবন দুর্বল হয়ে যায়। ফলে ভূমিকম্পে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ৬. পলিথিন আবৃত মাছ মাংস উত্তপ্ত হয়ে এক ধরনের বিকীরণ ছড়ায়। এতে মাছ মাংস বিষাক্ত হয়ে যায়। ৭. পলিথিন ভূ-গর্ভে পানি সরবরাহে বাধা দেয় এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি নীচে নেমে যায়। ফলে টিউবওয়েলে পানি পাওয়া যায় না।

পলিথিন ক্ষতিকর জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়ার বিস্তারে সাহায্য করছে। এসব ক্ষতিকর জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়া মহামারির কারণ হতে পারে। পলিথিন কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে শিশু কিশোররাও মারাত্মক রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। চর্মরোগ ও ক্যান্সারের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার পেছনে চিকিৎসকগণ পলিথিনের ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারকে দায়ী করছেন। রুটি, বিস্কুট, চিপস ইত্যাদি যে পলিথিনে প্যাকেট করা হচ্ছে, তা খাবারকে ঠিকই দূষিত করছে। অথচ খাবার সংরক্ষণে দরকার বিশেষভাবে তৈরি পলিথিন। কিন্তু সে খোঁজ আমরা রাখছি না।

কালো রঙের পলিথিন

কালো রঙের পলিথিন ব্যাগ বেশি ক্ষতিকর। এ ব্যাগে ব্যবহৃত রং খাবার জিনিসকে সহজেই দূষিত করে। তাছাড়া ফেলে দেয়া পলিথিন পরিষ্কার বা জীবাণুমুক্ত না করেই কালো রঙের পলিব্যাগ রিমেক করা হয়। বাংলাদেশের নগর জনপদ, এখন পলিথিনের সাম্রাজ্য হয়ে উঠেছে। পলিথিনের জঞ্জাল দোর্দন্ড প্রতাপে গ্রাস করছে নগরীকে। পলিথিনের সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটছে ছোট শহর গ্রাম-গঞ্জ সবখানে। লক্ষ লক্ষ পলিথিন ব্যাগ

জমা হচ্ছে ডাস্টবিনে। সেগুলো ফেলা হচ্ছে বিভিন্ন ভাগাড়ে। দূষিত হচ্ছে শুধু ঐ এলাকা নয়, সামগ্রিক পরিবেশ। ফলে জনস্বাস্থ্য দারুণ হুমকীর মুখে দাঁড়িয়েছে।

দূষণচক্রে নদী-মাছ-পরিবেশ: খাদ্যচক্রে প্লাস্টিক পলিথিন

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শুধু ঢাকা মহানগরীতেই প্রতিদিন ৮০ লক্ষ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার শেষে রাস্তাঘাট, নর্দমায় জমা হচ্ছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা বলেছিল, সমুদ্রোপকূলে প্লাস্টিক বর্জ্য অব্যবস্থাপনার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে ১০ম। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০০২ সালে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধের বিধান করেছিল। দুই দশক পর সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, দেশের পলিথিন ও প্লাস্টিক বর্জ্যের ৮৭ শতাংশই পরিবেশবান্ধব সঠিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ফেলা হয় না। এই বর্জ্য পরিবেশের ও প্রতিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করছে। 'বাংলাদেশে জলজ পরিবেশে প্লাস্টিকদূষণের প্রভাব: একটি মূল্যায়ন' শীর্ষক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে ২০০৬ থেকে ২০১৯ সালে প্রকাশিত ২৪টি গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে প্রতিদিন যে পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়, অনেক দেশে এক মাসেও সে পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য হয় না। পলিথিন ও প্লাস্টিক যে পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতিকর, তা এখানকার বেশির ভাগ মানুষই জানে না। বাংলাদেশে প্রতিদিন চার থেকে সাড়ে চার হাজার টন বর্জ্য তৈরি হয়। এর ১৭ শতাংশই প্লাস্টিকজাতীয়। এসব বর্জ্যের অর্ধেকই সরাসরি পানিতে বা নিচু ভূমিতে ফেলা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা শহরেই প্রতিদিন ১২৪ টন প্লাস্টিকজাতীয় বর্জ্য তৈরি হয়, যার ৮৬ শতাংশ আবার ব্যবহার করা হয়। বাকি যে অংশটি ব্যবহৃত হয় না, তার বেশির ভাগটা পলিথিন। এগুলো সরাসরি মাটি ও পানিতে গিয়ে জমা হচ্ছে। ফলে তা মাটি ও পানির জৈবগুণ নষ্ট করছে। একই সঙ্গে তা খাদ্যচক্রে প্রবেশ করে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণির শরীরে প্রবেশ করছে। ফলে ক্যানসারসহ নানা রোগ তৈরিতে তা ভূমিকা রাখছে। পর্যালোচনা প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের বাজারে যেসব রুই, লইট্টা, চিংড়ি ও সার্ডিন মাছ বিক্রি হচ্ছে, তার অর্ধেকের বেশির দেহে ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা পাওয়া গেছে। ২০২৫ সালে প্রকাশিত গবেষণায়, ইলিশেও মাইক্রোপ্লাস্টিক কণার বিস্তার ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে। মেঘনার নদীমুখে ধরা ইলিশের শরীরে বাসা বেঁধেছে ক্যাডমিয়াম, সিসা, পারদ, আর্সেনিকের মতো ভারী ধাতু।

প্লাস্টিকসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ে কাজ করা সংগঠন ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ESDO) জানাচ্ছে,নদীর মাছের পেটে তারা ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা বা মাইক্রোপ্লাস্টিক পেয়েছেন। এমনকি তা হাঁস-মুরগির পেটেও হচ্ছে। ফলে এসব প্রাণির বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে, আরও নানা রোগ হচ্ছে। আর সেখান থেকে মানুষের শরীরেও নানা রকম রোগবালাই প্রবেশ করছে। এখনো দেশে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ে তীব্র অসচেতনতা লক্ষ্য করা হচ্ছে।

প্লাস্টিক উৎপাদনের সময় প্রচুর গ্রিণহাউজ গ্যাস নি:সরণ হয়। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ওয়েস্ট কনসার্ণের করা জরিপে জানা হচ্ছে, শুধু ঢাকার চারপাশের চারটি নদীতে বিপুল

পরিমাণে প্লাস্টিক বর্জ্য জমে আছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে প্লাস্টিক উৎপাদনে প্রতি বছর প্রায় ১৭ মিলিয়ন ব্যারেল তেল ব্যবহার করা হয়। ঢাকায় প্রতি বছর ৫লাখ ৮৬ হাজার ৪১ কেজি প্লাস্টিক তৈরি হচ্ছে।

ফলে কার্বনডাই অক্সাইড নিঃসরিত হচ্ছে ২৯ লাখ ৩০ হাজার ২০৫ কেজি। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রতিবেদন বলছে, পৃথিবী জুড়ে প্রতি মিনিটে সাগরে মিশছে ১০ লাখ প্লাস্টিকের বোতল এবং প্রতি বছর সাগরে গিয়ে পড়ছে ১৩ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক। এরকম চলতে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে সাগরে মাছের তুলনায় প্লাস্টিকের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকার চাইলেই পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী মাছ ধরতে প্লাস্টিকের তৈরি জাল ও অন্যান্য সামগ্রীর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। এজন্য একই সঙ্গে জেলেদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পথে হাঁটতে হবে।

পলিথিন/প্লাস্টিক পোড়ালে কী হয়?

অনেকের মধ্যেই সাধারণ ধারণা আছে যে, পুড়িয়ে ফেললেই পলিথিনের জঞ্জাল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। পুড়ে যাওয়া পলিথিন থেকে উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেনসায়ানাইড নামের বিষাক্ত গ্যাস। মানুষের শরীরের জন্য এ গ্যাস খুবই ক্ষতিকর। খোলা জায়গায় পলিথিন পোড়ানো হলে তা আশপাশের মানুষের শ্বাসকষ্টের কারণসহ ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে ।

প্লাস্টিক বা পলিথিনের শেষ পরিণতি কেমন? বিজ্ঞানিরা হিসাব করে বলছেন, পলিথিন বা প্লাস্টিকের তৈরি ব্যাগের মাটির সঙ্গে মিশে যেতে, অথবা আগের অবস্থায় ফিরে যেতে সাড়ে চারশো বছরেরও বেশি সময় লাগে। আরেকটি গবেষণায় বলছে, এটা পচতে সময় লাগে প্রায় ৯৪০ বছর। গাছের পাতা, ফুল, ফল, বাকল এসব মাটিতে মিশে যেতে বেশি সময় লাগে না। এসব মাটিতে মিশে গিয়ে আবারও গাছের পুষ্টি হয়ে ফিরে আসে। অথচ সূর্যের তাপ, আবহাওয়ার আর্দ্রতা, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, এদের কোনটিই পলিথিনকে নষ্ট করতে পারে না। অর্থাৎ স্বাভাবিক বা জৈবনষ্টি পলিথিনের বেলায় ঘটে না।

তাহলে সমাধান কিসে/আমরা কী করতে পারি?

গড়ে প্রতি বছর পৃথিবী জুড়ে ৫ ট্রিলিয়ন প্লাস্টিক ব্যাগ বানানো হয়। সেই হিসেবে গড়ে জনপ্রতি বছরে ব্যাগ বানানো হয়েছে ৭০০টি। একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ গড়ে ১২ মিনিট ব্যবহৃত হয়। অথচ এটা পচতে সময় লাগে প্রায় ৯৪০ বছর। সে জন্যই পুন:প্রক্রিয়াজাত করা যায় এমন ব্যাগ উৎপাদনে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

থ্রি R পলিসি : Reduce, Reuse, Recycle

পলিথিনের বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে,পলিথিনের ব্যবহার কমিয়ে আনা, পুনর্ব্যবহার ও পুনরাবর্তন সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায়। নীতিগতভাবে গোটা বিশ্বে এর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া পলিথিন যে জঞ্জাল তৈরি করছে তাকে পুনর্ব্যবহার বা পুনরার্তনের আওতায় আনা দু:সাধ্য। হিসাব করে দেখা গেছে, বড়জোর ১০% শতাংশ পলিথিন ব্যাগ রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার করা সম্ভব হতে পারে। আর বাকি নব্বই ভাগ পলিথিন বড় রকমের ঝুঁকির কারণ হয়ে থাকছে। প্লাস্টিক

পণ্য নিতান্তই যদি ব্যবহার করতে হয়, তাহলে ফুডগ্রেড (ত্রিকোণ স্টিকারে ২,৪,৫) নম্বরযুক্ত পণ্যগুলো ব্যবহার করা। স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহার না করা।

পচনশীল পলিথিন উদ্ভাবন

বিজ্ঞানিরা অবশ্য পচনশীল পলিথিন উদ্ভানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ধরনের পলিথিন বা প্লাস্টিককে ব্যাকটেরিয়া পঁচিয়ে দিতে পারবে। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মিও এ ধরণের প্লাস্টিককে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারবে। এজন্য প্লাষ্টিকের সঙ্গে অতিরিক্ত শ্বেতসার বা সেলুলোজ মিশিয়ে তা ব্যাকটেরিয়ার খাওয়ার উপযোগী করে তুলতে হয়। শ্বেতসার মেশানো প্লাষ্টিকে ব্যাকটেরিয়া একবার ঢুকতে পারলেই প্লাষ্টিকের অণুগঠন ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য প্লাষ্টিকের পচে যাওয়া বা মাটিতে মিশে যাওয়া নির্ভর করবে প্লাষ্টিকে কতটা শ্বেতসার মেশানো যাবে তার উপর। সেই সঙ্গে মাটির গঠন, তাপ ও আর্দ্রতার পরিমাণও হিসেব করে দেখতে হয়। তবে এজন্য আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে গোটা দুনিয়া জুড়ে পলিথিনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্ছার হয়ে উঠছে। পরিবেশকে বাঁচানোর তাগিদে আমাদেরও পলিথিনের অপব্যবহার রুখতে হবে। পরিবেশ আর জনস্বাস্থ্যের জন্য পলিথিন মারাত্মক ক্ষতিকর, এসব কথা জেনেও পলিথিনকে পুরোপুরি বর্জন করা যাচ্ছে না। একসময় যেখানে একটিমাত্র চট বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহৃত হতো, এখন সেখানে ৫/৭টি পলিথিন ব্যাগ তার স্থান দখল করে নিয়েছে। কাজেই ধীরে ধীরে পলিথিনের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। তবে বাজারের ব্যাগ আর খাবারের মোড়ক হিসেবে পলিথিনের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা জরুরি। পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট থেকে উৎপাদিত চটের ব্যাগ, কাপড়, কাগজ বা নেটের ব্যাগের ব্যাপক প্রচলন করে সমস্যার অনেকটা সুরাহা করা সম্ভব।

২০২৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে সুপার শপে এবং ১লা নভেম্বর থেকে সবখানে পলিথিন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বর্তমান বিগত সরকারে এ বিষয়ে জিরো টলারেন্স নিয়ে কাজ করছে। বর্তমান বছর ২রা অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়ে সরকার ঘোষিত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষে সরকার ইতোমধ্যে ১৭ ধরনের সামগ্রীকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের তৈজসপত্র, চকলেটের মোড়ক, প্লাস্টিকের দাওয়াত কার্ড ও ব্যানার, স্টাইরোফোমের খাবার ধারক, পাতলা প্লাস্টিক মোড়কযুক্ত পণ্য, প্লাস্টিক বোতল ও ক্যাপসহ নানা সামগ্রী।

পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশে রয়েছে এ সংক্রান্ত আইন-কানুন। যাতে এ আইন ভঙ্গকারীকে কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড দেবার বিধান রয়েছে। দরকার আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগ করা। তবে শুধু আইন প্রয়োগে সমস্যার সবটা সমাধান করা যায় না। সেই সাথে দরকার জনউদ্যোগ। পাটের আঁশ থেকে পলিমার তৈরি করে তা থেকে পরিবেশবান্ধব সোনালী ব্যাগ বানিয়েছেন বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের (বিজেএমসি) প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক মোবারক আহমদ খান। তাঁর এ উদ্ভাবন এতদিন বিনিয়োগ পায়নি। বাণিজ্যিকীকরণ করা যায়নি। অন্তরবর্তী সরকারের প্রচেষ্টায় সাম্প্রতিককালে এর উৎপাদন, বিপণন উৎসাহ সৃষ্টি করেছে ।

তরুণ উদ্ভাবক মাহবুব সুমন আলুর স্টার্চ থেকে পচনশীল পলিথিন বানিয়ে দেখিয়েছেন। প্রতিকেজি আলু থেকে ১৫টি পলিথিন বানানো যায়। এই পলিথিনের দাম পড়ে তিন

টাকার মতো। এর ধারণ ক্ষমতা ৫-৬ কেজির মতো। আর এটা ৩০দিনের মধ্যে পচে যায়। ২০০৮ সালে কাসাভা (শিমূল আলু) থেকেও পচনশীল পলিথিন উদ্ভাবন করেছে ইকোস্পিয়ার নামে আমাদের দেশি প্রতিষ্ঠান।

পলিথিন- প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো

পানি বা কোল্ড ড্রিংকস এর বোতলও বড় সমস্যা। বিশ্বে প্রতি বছর পানির বোতলই বিক্রি হয় ২৮ বিলিয়ন। বোতল ব্যবহার কমাতে কিছু উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। প্রতিটি দোকানে বোতল সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা। বোতলের জন্য একটু বেশি দাম রাখা। দোকানে খালি বোতল ফেরত দিলে বাড়তি টাকা ফেরত পাওয়া যাবে, এরকম নিয়ম চালু করা।

সবার সাথে, স্কুলে অফিসে কাজের ক্ষেত্রে হট ওয়াটার টাইপের বোতল রাখা। যাতে আফিস, অনুষ্ঠান, রেস্তোরাঁয় সবখানে রিফিল করে নেয়া যায়, সেটা পানি, কোল্ড ড্রিংকস,কফি যাই হোক। খাবার কেনার জন্য নিজের পাত্র, বাটি, বোতল ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া। বাজার থেকে শুকনা জিনিসপত্র কেনা, লন্ড্রিতে কাপড় দেয়া এসব কাজে প্লাস্টিক পলিথিন ব্যাগের প্রয়োজন নেই। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া পলিথিন ব্যবহার না করা। বর্জ্য ফেলার সময় প্লাস্টিক বর্জ্য আলাদা পাত্রে ফেলা। এতে রিসাইকেলের জন্য বাছাই করে নেয়া সহজ হয়।

বেশি ক্ষতিকর ছোট ছোট কালো পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। পুন:ব্যবহার যোগ্য ধাতব এবং কাঁচের পাত্র ব্যবহার করতে পারলেও পরিবেশ রক্ষা করা যাবে। এলুমিনিয়াম, স্টিল, কাসা, পিতল এর সাথে ক্ষেত্রমত সুপারির খোল এবং মাটির পাত্র ব্যবহারে অভ্যস্থ হওয়া। এছাড়া ব্যবহৃত পলিথিনের ব্যাগ বোতল, পাত্র বর্জ্য হিসেবে যেখানে সেখানে ফেলার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। মাছ ধরতে সূতার তৈরি জাল ও বাশেঁর তৈরি মাছ ধরার সামগ্রী জনপ্রিয় করার জন্য সরকারের উদ্যোগ নিতে হবে। গোটা কয়েক পাতলা কাপড়ের ব্যাগ সব সময় সাথে রাখা। যেগুলো সুবিধামত ধুয়ে পুন: পুন: ব্যবহার করা যায়। সব মানুষ যদি অপ্রয়োজনে প্লাস্টিক পলিথিন ব্যবহার কমিয়ে দেয়, পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেয়, তাহলে দেশে পলিথিন, প্লাস্টিক দূষণ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সম্ভব।

প্লাস্টিকদূষণ একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এ সমস্যা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনতে হবে। শুধু নিজের স্বার্থেই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এভাবে আমরা দূষণমুক্ত একটি নিরাপদ ও পরিবেশ-বান্ধব সুন্দর পৃথিবী উপহার দিয়ে যেতে পারবো আগামী প্রজন্মের জন্য। জেন জি-দের পরিবেশ ভাবনাও এরকমই।

এজন্য আমাদের আরো বেশি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন হতে হবে। পলিথিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্কুল কলেজ এবং সব স্তরের মানুষের মধ্যে আচরণ অভ্যাস পরিবর্তনমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের ছোট ছোট সতর্কতায় স্বাস্থ্যকর সুন্দর ও নির্মল পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবো।

তথ্যসূত্র/কৃতজ্ঞতা:

১। মাহফুজ উল্লাহ ও অন্যান্য (গ্রন্থনা ও সম্পা), আমার পৃথিবী আমার পরিবেশ, সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা, সেপ্টেম্বর,২০০১।
২। প্রফেসর আইনুন নিশাত ও অন্যান্য (স), পরিবেশ শব্দকোষ, সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০০১।
৩। সুব্রত কুমার সাহা, পরিবেশ বিজ্ঞান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০০৭।
৪। প্রচারপত্র, পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা।
৫। জেবা ইসলাম সেরাজ, প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই, বিজ্ঞানচিন্তা, ঢাকা, জুন-২০২১, পৃ:২৯-৩৫।
৬। সুব্রত সরকার, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিবেশ বিষয়ক প্রতিবেদন দলের সদস্য।
৭। ইফতেখার মাহমুদ, প্রথম আলো, ২২ ডিসেম্বর ২০২০।
৮। পার্থ শঙ্কর সাহা, মেঘনার ইলিশে প্লাস্টিকের কণা, মানুষের শরীরে প্রভাব কতটা, প্রথম আলো, ঢাকা, ১৭ জুন, ২০২৫
৯। দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ জুলাই, ২০২৫।

লেখক:
মো: সিরাজুল ইসলাম
প্রফেসর, সরকারি বিএল কলেজ, খুলনা।

চন্দ্রজয় থেকে মঙ্গল গ্রহ

জহুরুল হক বুলবুল

মানুষের চন্দ্র জয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করল ২০১৯ সালে। ধরতে গেলে মানুষের চাঁদে যাওয়ার ব্যাপারটা মূলত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের অসুস্থ স্নায়ুযুদ্ধের ফসল। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য অন্যান্য অনেক কিছুর পাশাপাশি স্পেস রেসও শুরু করেছিল ১৯৪৭ সালে– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে।

মহাকাশ গবেষণায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন যুক্তরাষ্ট্রক থেকে এগিয়ে। মহাকাশে প্রথম স্যাটেলাইট স্পুটনিক-১ পাঠিয়েছিল সোভিয়েত ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর। ১৯৫৭ সালের ৩ নভেম্বর স্পুটনিক-২ এ মহাকাশে প্রথম প্রাণী লাইকা নামের এক কুকুর। মানুষের প্রথম মহাকাশযাত্রার ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল। ভস্তক-১ চেপে মহাকাশ ঘুরে এসেছিলেন রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন। ১৯৬৩ সালে ১৬ জুন ভস্তক-৬ নভোযানে চড়ে মহাকাশে যান ভ্যালেনটিনা তেরেস্কোভা পৃথিবীর প্রথম মহিলা নভোচারী। চাঁদের মাটিতে নামা প্রথম নভোযান লুনা-২। সে কৃতিত্বটাও সোভিয়েত ইউনিয়নের। একের পর এক সোভিয়েতের সাফল্যের পর।

যুক্তরাষ্ট্রকে চাঁদে যাওয়ার জন্য অন্তত ১০ হাজার সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল। সব সমস্যাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের সমাধান করতে হয়েছিল ১৯৬১ সালের মে থেকে ১৯৬৯ সালের জুলাইয়ের মধ্যে। ম্যানহাটান প্রজেক্টে পারমাণবিক বোমা বানানোর চেয়ে তিন গুণ বেশি মানুষ কাজ করেছিল অ্যাপোলো অভিযানকে বাস্তবায়ন করতে। অ্যাপোলো প্রকল্পে বিশ্বের চার লাখ মানুষের নিরলস শ্রম ও মেধার গৌরব জড়িয়ে রয়েছে চন্দ্রজয়ের ইতিহাসের সঙ্গে।

১৯৬১ সালে কেনেডি যখন চাঁদে অভিযানের কথা ঘোষণা করেন– সে বছর নাসা এই অভিযানের কর্মসূচিতে খরচ করেছিলেন ১০ লাখ ডলার। বর্তমান হিসেবে সেটা প্রায় ১৫ হাজার কোটি ডলার। বাংলাদেশি টাকায় ১২ লাখ কোটি টাকা। এর পাঁচ বছর পর নাসা অ্যাপোলো অভিযানের জন্য প্রতিদিন ৩ ঘন্টায় খরচ করছিল ১০ লাখ ডলার। এ বাজেট ছিল যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির ২৫ শতাংশ। আর এই বাজেট দেয়া হয় টানা ১০ বছর। কর্মযজ্ঞের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে এখান থেকে সহজেই ধারণা করা যায়। এত বাজেটের জন্য এক শ্রেণির মার্কিনী ক্ষোভে ফেটে পড়ল। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন কিছু বিজ্ঞানী ও গবেষক। তাঁদের দাবি স্রেফ প্রতিযোগিতার নামে অত অর্থ অপচয়ের কোনো মানে হয় না। তার বদলে ক্যানসারসহ অন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক গবেষণায় টাকা ঢালা দরকার। এ ছাড়াও ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে নিউইয়র্ক টাইমসের এক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল– চাঁদে অভিযানের মোট খরচ দিয়ে হার্ভার্ডের সমান আকারের ৭৫ থেকে ১২০টি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা যায় এবং তারপরও কিছু টাকা বেঁচে যাবে। সম্পাদকীয় কথার মূলভাবটি ছিল– চাঁদে অবতরণ নাকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি রাজ্যে একটি করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৬২ সালের শরৎকালে প্রেসিডেন্ট কেনেডি চাঁদে অভিযানের প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন। এ সময় কেনেডি বলেছিলেন– যুক্তরাষ্ট্র যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরা অপেক্ষা করতেন না, বিশ্রাম নিতেন না। কিছুদিন পরই সাবেক প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের এক জমায়েতে কেনেডির জোর সমালোচনা করে বলেন– যে মানুষ দেশের প্রতিপত্তি দেখাতে চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য অত অর্থ অপচয় করে সে পাগল। ১৬০ জন রিপাবলিকান সদস্য আইজেনহাওয়ারের কথাকে সমর্থন জানান।

সমালোচনা জমে উঠতেই কেনেডি জবাব দিতে বাধ্য হলেন। জবাবটা দিলেন ১৯৬২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে নাসার মানুষবাহী স্পেসফ্লাইট সেন্টারের উদ্বোধন করতে গিয়ে। তাঁর জবাবে পর্বতারোহী জর্জ ম্যালোরির কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল। যুক্তরাষ্ট্রের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল স্টেডিয়ামে সেদিন উপস্থিত প্রায় ৪০ হাজার মানুষ। জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে কেনেডি দৃপ্তকণ্ঠে বললেন– অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, আমরা চাঁদে কেন যেতে চাই? আমরা কেন এ রকম লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি? তারা হয়তো এটাও জিজ্ঞেস করে বসতে পারে, আমরা সর্বোচ্চ পাহাড়চূড়ায় কেন উঠি? কেন ৩৫ বছর আগে আটলান্টিক প্লেনে পাড়ি দিয়েছি? এ দশকে আমরা চাঁদে যেতে চেয়েছি, চাঁদে যেতে চেয়েছি, চাঁদে যেতে চেয়েছি। কেনেডি কথা শেষ করার আগেই ৪০ হাজার মানুষের তুমুল করতালি আর হর্ষধ্বণিতে ফেটে পড়ল গোটা এলাকা। সেই গর্জনে এক তুড়িতেই যেন খড়কুটোর মতো উড়ে গেল চন্দ্র অভিযানের বিপক্ষবাদীরা।

যুক্তরাষ্ট্র যখন চাঁদে মানুষ পাঠানোর কথা ভাবছে– তখন তাদের সত্যিকার অর্থেই সে ক্ষমতা ছিল না। আজকের মতো উন্নত কম্পিউটার, রকেট, স্পেসস্যুট, নভোচারীদের খাবার কিংবা অন্যান্য প্রযুক্তির কিছুই ছিল না তাদের। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা শক্তির জোরে মাত্র ৮ বছরের মাথায় যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা যায়, সেটা মানব ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেটি চাক্ষুষ করে যেতে পারলেন না কেনেডি। ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর আততায়ীর গুলিতে নিহত হন তিনি। তাঁর স্মরণে ফ্লোরিডায় নাসার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের নাম রাখা হলো কেপ কেনেডি। এখান থেকেই অ্যাপোলো প্রজেক্টের প্রথম মানুষবাহী কর্মসূচি শুরু হবে। কিছুদিন পর অ্যাপোলো-১ এ চড়ে পৃথিবীর নিম্নকক্ষপথ পরীক্ষা করে দেখা হবে। মহাকাশে যাবেন তিন নভোচারী। তাঁরা হলেন ভার্জিল গ্রিসম, এডওয়ার্ড হোয়াইট আর রজার শ্যাফি। রকেটের মাথায় বসানো কমান্ড মডিউলে অভিযানের চূড়ান্ত মহড়া চলছিল। কাজের শুরুতেই হঠাৎ বিদ্যুতের তার থেকে স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। মুহূর্তেই সে আগুন দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়ল। কমান্ড মডিউলের ভেতরে ১০০% অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল ব্যবহার করা হচ্ছিল। এই বিশুদ্ধ অক্সিজেন পরিবেশে, স্ফুলিঙ্গটি দ্রুত একটি ভয়াবহ আগুনে পরিণত হয়। নভোচারীদের মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল আগুন নয়, বরং অত্যন্ত দ্রুত ছড়ানো ধোঁয়া এবং কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়া (Carbon Monoxide Poisoning)। এছাড়াও, কমান্ড মডিউলের দরজাটি ভেতরের দিকে খোলা (Inward Opening Hatch) হওয়ায় এবং উচ্চ চাপে (High Pressure) দ্রুত সেটি খোলা সম্ভব হয়নি।



অ্যাপোলো-১ এর নিহত তিন অভিযাত্রী

শুরুতেই এহেন দুর্ঘটনা ছিল অ্যাপোলো মিশনের জন্য বড় এক ধাক্কা। অনেকেই আশঙ্কা করেছিল, অ্যাপোলো মিশন বুঝি শুরুতেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তা না হয়ে নাসা আরও দৃঢ় হলো তাদের কাজে। বিজ্ঞানীরা নভোচারীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও কড়াকড়ি করলেন। এত সতর্কতার ভেতর দিয়ে আরও ৯টি মিশন সফলভাবে সমাপ্ত করলেন। অ্যাপোলো-১০ মিশনটাকে বলা যেতে পারে অ্যাপোলো-১১ এর কপি। অ্যাপোলো-১১ মিশনের মাত্র দুই মাস আগের সব ফাংশনালিটি শেষবারের মতো চেক করে নিতে একে পাঠানো হয়। অ্যাপোলো-১০ চাইলে চাঁদে নামতে পারতো। কিন্তু তাঁদের আগে থেকেই কড়াভাবে নিষেধ করা হয়েছিল। তাই কমান্ড মডিউল থেকে লুনার মডিউল বিচ্ছিন্ন হয়েও চাঁদে নামতে পারেনি।

এভাবেই কেনেডির ঐতিহাসিক ঘোষণার পর দীর্ঘ আট বছরের শেষ হলো চাঁদে অবতরণের সব প্রস্তুতি। আগে থেকেই সব দিক বিবেচনা করে বাছাই করছিল নভোচারী। কাজটি করার জন্য দুনিয়ায় তখন বোধ হয় এই তিনজন মানুষই ছিলেন। মাইকেল কলিন্স, বাজ অলড্রিন এবং নীল আর্মস্ট্রং। এই তিন নভোচারী ছিলেন সামরিক বাহিনীর পরীক্ষিত বৈমানিক– যাঁরা ইতোমধ্যে অনেক বিপদ-সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। অনেক কঠিন ফ্লাইট পরিচালনা করেছেন। নভোচারীদের বয়স চল্লিশের নিচে থাকারই বিধান। স্বাস্থ্য হতে হয় খুবই চমৎকার। তবে লম্বায় পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চির বেশি হলে চলবে না। কারণ এর চেয়ে দীর্ঘ শরীর নভোযানের ক্যাপসুলের মতো স্থানে গুটিয়ে রাখা সত্যি কষ্টকর। যখন অ্যাপোলো-১১ এর জন্যে তিন নভোচারী নির্বাচিত হলেন– তখন তাঁদের সবার বয়স ছিল ৩৫-৩৯ বছরের মধ্যে। তবে দীর্ঘকায় নভোচারীদের জন্যে বিধি-বিধানের সামান্য রদবদল করা হয়। উচ্চতার ক্ষেত্রে আরো এক ইঞ্চি বাড়িয়ে ৬ ফুট করার সিদ্ধান্ত নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমান্ড-মডিউলকেও সামান্য বদলে ফেলা হয়। তারপর, স্বাভাবিকভাবে কমান্ড-মডিউলও হয়ে উঠে ছোট্ট একটি শয়ন কক্ষের মতো। নাসা তাঁদের নিয়ে– বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিল।

তাঁদের তিনজনের এক গাড়িতে একসঙ্গে চলা নিষিদ্ধ ছিল। যেন দুর্ঘটনায় তাঁরা সবাই একসঙ্গে আহত বা নিহত না হন।

অ্যাপোলো-১১ এর অভিযাত্রীরা মহাশূণ্যে পৌঁছে ছিলেন একটি তিন স্তর বিশিষ্ট স্ট্যাটার্ন ভি-রকেটের মাধ্যমে। প্রতিটি অংশে পৃথক ইঞ্জিন ও ফুয়েল ট্যাংক ছিল। জ্বালানি হিসেবে এই রকেটের মধ্যে পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি ছাড়াও ছিল কয়েক টন তরল হাইড্রোজেন আর তা জ্বালানোর উপযোগী তরল অক্সিজেন। একটি অংশের জ্বালানি ফুরিয়ে গেলেই পরবর্তী অংশটি আগেরটির দায়িত্ব নেয়। অনেকটা রিলে দৌড়ের মতো। প্রথম অংশটি দীর্ঘতম, ১৩৮ ফুট (৪৩ মি.) দীর্ঘ। এর পাঁচটি শক্তিশালী ইঞ্জিন ভূমি থেকে রকেটটিকে ৩৯ মাইল (৬২ কিমি.) ওপরে নিয়ে গেছে। প্রথম অংশের পর দায়িত্ব নেয় দ্বিতীয় অংশটি। এটি ৮২ ফুট (২৪ মি.) দীর্ঘ ও পাঁচটি ইঞ্জিন বিশিষ্ট। দ্বিতীয় অংশটি রকেটকে নিয়ে গেছে ১১৫ মাইল (১৮৫ কিমি.) দূরত্বে। ৫৮ ফুট (প্রায় ১৮ মি.) দীর্ঘ তৃতীয় অংশটিতে আছে ৩ ফুট (১ মি.) দীর্ঘ ইন্সট্রুমেন্ট বা যন্ত্রাংশ ইউনিট ও একটি মাত্র ইঞ্জিন। একে দুইবার চালু করা হয়। একবার অ্যাপোলো-১১ কে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশ করানোর জন্য ও দ্বিতীয়বার কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে চাঁদের গতিপথে প্রবেশের সময়। এবার এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ১৯৬৯ সালের জুলাই। মানুষের ইতিহাসে দুঃসাহসিক অভিযানে যাত্রা শুরু করে অ্যাপোলো-১১। রকেটের মাথায় চড়েন তিন নভোচারী কমান্ড মডিউল পাইলট মাইকেল কলিন্স, লুনার মডিউল পাইলট বাজ অলড্রিন এবং কমান্ডার নীল আর্মস্ট্রং।

তারিখটা ১৬ জুলাই সকাল। একটি বিশাল স্ট্যাটার্ন-ভি রকেট দাঁড়িয়ে আছে ফ্লোরিডার একটি উত্তাল মঞ্চে (Launch Pad)। হাজার হাজার পাউন্ড জ্বালানি নিয়ে রকেটটি যেন গর্জন করছে। তরল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পূর্ণ ট্যাংক থেকে তীব্র বেগে বাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে রকেটের চারপাশে। অ্যাপোলো-১১ সর্ববৃহৎ রকেট, ভূমি থেকে প্রায় ৩০০ ফুটেরও (৯০ মি.) বেশি উচ্চতায় ছিল নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। ভেতরে নভোচারীরা তাঁদের শেষ মুহূর্তের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত। শুরু হতে যাচ্ছে চাঁদে মানুষের প্রথম কদম ফেলার অভিযান।



ঘড়ির কাটায় মাত্র সকাল ন'টা পেরিয়েছে, কিন্তু উজ্জ্বল সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়েছে অন্তরীক্ষের সৈকত ও সড়কগুলোতে। উড্ডয়ন পর্ব দেখতে প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে কেপ কেনেডি স্পেস সেন্টারের আশেপাশের কয়েক কিলোমিটার এলাকা লোকে লোকারণ্য। উপস্থিত হয়েছে প্রায় দশ লাখেরও বেশি মানুষ।

এদের বেশির ভাগই এসেছে আনন্দ-উল্লাস করতে। কেউ কেউ হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার নিয়ে এসেছে মহাকাশ খাতে মার্কিন সরকারের বিপুল অর্থ অপচয়ের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ জানাতে। কিন্তু পক্ষ হোক আর বিপক্ষ হোক, সেদিন সেখানে উপস্থিত সবাই জানত, তারা আজ মানব জাতির অনেক বড় এক ইতিহাসের সাক্ষী হতে যাচ্ছে। এ এমন এক ইতিহাস, যা যুগ যুগ ধরে বলে গেলেও পুরোনো হবে না। এদিকে উড্ডয়ন মঞ্চ হতে ৩ মাইল দূরে আমন্ত্রিত অতিথির জন্য নির্ধারিত আসনগুলোও এরই মধ্যে কানায় কানায় পূর্ণ।

কিছুক্ষণ পরেই দুঃসাহসী তিন নভোচারীকে নিয়ে প্রায় ৩ লাখ ৮৪ হাজার কিলোমিটার দূরের চাঁদের পানে ছুটে যাবে অ্যাপোলো-১১ নামের নভোযান। শুধু তাই নয়, মানব ইতিহাসে এবারই প্রথম পৃথিবীর বাইরে পা রাখবে মানুষ, চরকা কাটা চাঁদের বুড়ির দেশে পা রাখবে। ইতিহাসে এবারই প্রথম পৃথিবীর বাইরে পা রাখবে মানুষ, চরকা কাটা চাঁদের বুড়ির দেশে পা রাখবে। স্থানীয় সময় ঘড়িতে সকাল ৯টা বেজে ৩২ মিনিট। কাউন্ট ডাউন শুরু হলো। 'টি মাইনাস ফিফটিন সেকেন্ড টুয়েলভ, ইলেভেন, টেন, নাইন' ইগনিশন বা দীপন শুরু হলো।



কমলা রঙের অগ্নিশিখা ও কালো ধোঁয়ার যেন অগ্ন্যুৎপাত ঘটল পাঁচ ইঞ্জিনের স্যাটার্ন রকেট থেকে, কিন্তু তখনও এটি ছিল নিশ্চল দাঁড়িয়ে। 'সিক্স, ফাইভ, ফোর, থ্রি, টু, ওয়ান, জিরো।' প্রতিটি ইঞ্জিন কাজ শুরু করেছে। 'উৎক্ষেপন আমাদের সফল।' অ্যাপোলো-১১ ধীরে ধীরে টাওয়ার ছাড়িয়ে উঠছে, যেন সে পৃথিবীর মায়া ছাড়তে পারছে না। ক্রমেই বাড়তে লাগল তার বেগ। অ্যাপোলো-১১ কে ওঠার দৃশ্য দেখে লাখ লাখ দর্শক উল্লাসে ফেটে পড়ল। কেউ কেউ আবেগের ভার সইতে না পেরে কেঁদে ফেলতেও দ্বিধা করল না।

ঐ দিন সকালের আকাশটাও বেশ পরিষ্কার ছিল। ফলে উড্ডয়নের ৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড পরে নভোযান থেকে স্যাটার্ন রকেটের প্রথম অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সকল কলাকৌশলই দেখতে পেল পরিষ্কার। এই অল্প সময়েই এটি প্রায় সাড়ে চার মিলিয়ন পাউন্ডেরও (দুই মিলিয়ন কেজি) বেশি জ্বালানি পুড়িয়েছে। প্রায় ছয় মিনিটের মাথায়, দর্শক ও টেলিভিশনের ক্যামেরার দৃষ্টি সীমার বাইরে রকেটের দ্বিতীয় অংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অলড্রিন হঠাৎ দেখলেন তাঁর স্পেসস্যুটের একটি অংশ ভাসছে এবং তিনি আপনা-আপনি সিট থেকে শূণ্যে ওঠে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর সিটের বন্ধনী যে তাঁকে আটকে ধরে আছে। অ্যাপোলো-১১ ততক্ষণে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে কক্ষপথ বা অরবিটে প্রবেশ করেছে।

অ্যাপোলো-১১ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে দেড়টি চক্র সম্পন্ন করার পর এর তৃতীয় পর্যায়ের ইঞ্জিনটি চালু হলো। রাতারাতি এর গতিবেগ দাঁড়াল প্রতি ঘন্টায় ২৫,০০০ মাইল বা ৪০,০০০ কিমি.। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে পরাজিত করার জন্য এই গতি যথেষ্ট বটে। এখনই অভিযানের প্রথম জটিল কৌশল প্রয়োগের সময়। লুনার মডিউল তৃতীয় পর্যায়ে স্যাটার্ন রকেটের শেষ প্রান্তে যুক্ত ছিল এবং এর সামনে ছিল কমান্ড মডিউল। কমান্ড মডিউলের পাইলট মাইকেল কলিন্স নভোযানের অবশিষ্ট তৃতীয় অংশটি থেকে কমান্ড মডিউলটি বিচ্ছিন্ন করলেন। যা তাঁদের নিয়ে এসেছিল মহাকাশে। এখন তাঁরা পৃথিবী থেকে ৫০,০০০ মাইল বা ৮০,০০০ কিমি. দূরে। এরপর কলিন্স নভোযানটিকে ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। ব্যাপারটা অনেকটা শিখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাবাব ঝলসানোর মতো। এই এপাশ-ওপাশ ঘুরানোটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এপাশ-ওপাশ না

করে নভোযানটি যদি সোজা চাঁদের দিকে এগিয়ে যায় তবে সূর্যের তাপ পাবে নভোযানের একটি পাশ, অপর প্রান্ত পাবে না। ফলে এক প্রান্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠবে ও নিশ্চিতভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে ফুয়েল-ট্যাংকারে। অপর পাশটি তাপ হারিয়ে হয়ে যাবে অস্বাভাবিক শীতল। এতই শীতল যে সব কিছু জমে যাবে।

পাঁচ ঘন্টা পেরিয়েছে এরই মধ্যে। অবশেষে নভোচারীরা স্পেসস্যুট থেকে নিজেদের মুক্ত করলেন। সবাইকে এই ছোট্ট পরিসরে অনেক কষ্টে স্পেসস্যুট খুলতে দেখে মনে হলো– এ যেন খুব ছোট একটি পানির ট্যাংকে তিনটি সাদা তিমি ঝাঁপা-ঝাঁপি করছে।

সকালের নাস্তার পর অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত সবাই। মহাশূন্যে প্রথম খাওয়া। নভোচারীরা বাড়িতে কী কী খান? ভাত ও মুরগি, মাংস ও কুচি করে কাটা আলু, অথবা সসযুক্ত মাংসের সাথে মিষ্টি বা পুডিং। এসবই তো! কিন্তু অভিযানের খাবার মেনু মোটেও এরকম নয়। সে খাবার হতে হয় পুষ্টিকর কিন্তু ওজনে হালকা। নভোচারীরা ৭০ টির মতো আইটেম বাছাই করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাদের বেশিরভাগ খাবারই হয় শুকনো। ঠাণ্ডা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভর্তি থাকে। খাওয়ার আগে অবশ্যই রান্না করার ব্যাপারটা আসে। রান্নার প্রক্রিয়া হচ্ছে অনেকটা এরকম– পিস্তলের মতো দেখতে একটি ডিভাইসের ছিপি থেকে সজোরে গরম পানি পাত্রে ছিটিয়ে নিতে হবে। ব্যাস, খাবার তৈরি। গরম ও সুস্বাদু! খাবার। অলড্রিন এতেই সন্তুষ্ট, আর যাই হোক চামচ তো ব্যবহার করা যাচ্ছে। এর আগের অভিযানগুলোতে (প্রস্থতিমূলক) তরল খাবার দেয়া হতো অভিযাত্রীদের।

মহাশূণ্যে অভিযাত্রীদের প্রথম দিনটি অলড্রিনের মনে হতো পৃথিবী যেন কতদূরে! অনেকেরই জানা নেই পৃথিবী চাঁদের চেয়ে চারগুণ বেশি আলো ছড়ায়। মহাকাশযানের ভেতরে পৃথিবীর আলো এতটাই উজ্জ্বল যে কেউ চাইলে বই পড়তে পারবে।



চাঁদ থেকে দেখা পৃথিবীর একটি দৃশ্য

সফল উৎক্ষেপণের পর চৌদ্দ ঘন্টা কেটে গেছে। ঘুমের প্রয়োজন। সূর্য থেকে বাঁচার জন্য অভিযাত্রীরা জানালায় পর্দা এবং পর্দার মতো কভার লাগিয়ে নিলেন। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন নিজেদের দোলনার মতো বিছানাতে শক্ত করে বেঁধে নিলেন। এরপর ঘুম। তাঁদের দোলনাগুলো কমান্ড মডিউলে ভাসতে লাগল। কলিন্স একটি সিটে নিজেকে বেঁধে ঘুমালেন– যাতে ভেসে যেতে না হয়।

দ্বিতীয় দিন। বার ছিল বৃহস্পতি। পৃথিবীকে জানালা দিয়ে দেখাচ্ছিল ঘড়ির ডায়ালের সমান। পরবর্তী দুটি দিন হবে অভিযানের সবচেয়ে মন্থর ও কর্মহীন সময়। কারণ এর মধ্যে মহাকাশযানটি চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে ২,৪০,০০০ মাইল বা ৩,৮৬,০০০ কিমি.।

এই দুদিনে তাঁদের কিছু যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে হবে। ছবি তুলতে হবে। কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। কিন্তু সবকিছুর পরেও হাতে থাকবে অফুরন্ত সময়।

শনিবার। সকালের নাস্তার সময় মহাকাশ যানের চারপাশ যেন অন্ধকার ঘিরে ধরল। কারণ তাঁরা এখন চাঁদের ছায়ার মধ্যে। সূর্যের আলো না থাকায় প্রথমবারের মতো তাঁরা দেখলেন– পুরো আকাশ ছেয়ে আছে শত শত ঝকঝকে তারায়। অপরদিকে জানালায় তখন চাঁদ আবির্ভূত হয়েছে। বড় ও গভীর সব ক্ষত নিয়ে ভূতুড়ে নীল আলোয় প্লাবিত সেই চাঁদ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কলিন্স মহাকাশ যানের রকেটের গতি কমিয়ে দিলেন। যাতে এটা চাঁদের আকর্ষণের মধ্যে চলে আসে। মহাকাশযানটি ৭০ মাইল বা ১১৩ কিমি. দূর থেকে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। এতে একবার চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগছে দু'ঘন্টা করে। সন্ধ্যের মধ্যে অলড্রিন নিশ্চিত করে ফেললেন চাঁদের ঠিক কোন জায়গায় আগামীকাল অবতরণ করবেন। জায়গাটার নাম শান্ত সাগর। কিন্তু অভিযাত্রীরা দেখলেন জায়গাটা যথেষ্ট উঁচু-নিচু ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। অলড্রিন ভাবলেন আগামীকাল সূর্য উঠলে অবস্থা নিশ্চয়ই চমৎকার হয়ে উঠবে।

পঞ্চমদিন। রোববার। সকালের নাস্তার পর আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চাঁদের উপযোগী পোশাক পরে নিলেন। পোশাকগুলোতে শত-শত প্লাস্টিক টিউব লাগানো। তাঁরা যখন চাঁদে নামবেন– এই টিউবগুলো দিয়ে ঠাণ্ডা পানি প্রবাহিত হবে– যা তাঁদেরকে চাঁদের অতিরিক্ত তাপ থেকে রক্ষা করবে। এ পোশাকের ওপরে আবার একপ্রস্থ পোশাক চড়ালেন। কমান্ড মডিউলের এই ছোট্ট পরিসরে পোশাক-আশাক পরা সত্যি কষ্টকর। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন একটি ছোট্ট টানেলের মধ্য দিয়ে লুনার মডিউলে প্রবেশ করলেন। তাঁরা বৈদ্যুতিক পাওয়ার চালু করে সব সুইচ পরীক্ষা করে দেখলেন। ঠিকই আছে। কলিন্স সুইচ টিপে মহাকাশযানটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেললেন। এখন, কমান্ড মডিউল ও লুনার মডিউল পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। কমান্ড মডিউলের নাম 'কলম্বিয়া' আর লুনার মডিউলের নাম 'ঈগল'। ঈগল নামটি দেয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পাখি ঈগলের ওপর ভিত্তি করে। এক হিসেবে ঈগল ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নভোযান।

যখন ঈগল আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনকে নিয়ে চাঁদে অবতরণ করবে– তখন কলিন্স চাঁদের কক্ষপথে কলম্বিয়ায় একা অবস্থান করবেন। কারণ গোটা মহাকাশযানটা নিয়ে চাঁদের বুকে নামা সম্ভব নয়। যদিও নামতে পারে সেটিকে তুলে নিয়ে পৃথিবীর দিকে রওনা অসম্ভব। জাহাজ যেমন সমুদ্রে তীরের কাছাকাছি কোথাও নোঙর করে এবং তারপর যাত্রীরা যেমন ছোট ছোট নৌকা বা লাইফ-বোটে করে জেটিতে এসে ওঠে। ইগলের কাজটাও অনেকটা তেমন।


অ্যাপোলো-১১ এর চাঁদে অবতরণকারী অংশ 'ঈগল'।

ঈগলের পাখা আছে। আছে চারটি পা। ঈগল মাকড়সার মতো চারটি পা ছড়িয়ে দিল। কলিন্স কলম্বিয়া থেকে তাঁর দুই সহযাত্রীকে বিদায় জানালেন। 'নিজেদের যত্ন নিও আবার দেখা হবে।' আর্মস্ট্রং বিদায় দিলেন। ঈগল থেকে কলম্বিয়া দূরে সরে আসছে।

ঈগল ৩০০০ মাইল ৪৮০০ কিমি. গতিতে চাঁদে অবতরণের জন্য নেমে আসছে। আর্মস্ট্রং লুনার মডিউলকে চালাচ্ছেন আর নজর রাখছেন চন্দ্রপৃষ্ঠের দিকে– সুবিধাজনক অবতরণস্থানের জন্য। অলড্রিন বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটারের দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে নামতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। এমন সময় ঈগলে হঠাৎ ত্রুটি দেখা দিল, বেজে ওঠল অ্যালার্ম। উজ্জ্বল বাতি জ্বলতে-নিভতে লাগল। এ এরর কোড ১২০২। চাঁদের মাটি থেকে তখন ঈগলের দূরত্ব ৩০০০ ফুট বা ৯২৩ মিটার। কিন্তু আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন বুঝতে পারলেন না সেটা কিসের সংকেত। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাউন্ড কন্ট্রোলও বুঝতে পারছে না সেটি। শেষ পর্যন্ত চাঁদের এত কাছে এসে কি তাঁদের ফিরে যেতে হবে নাকি? একদম শেষ সময়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা আরেক বিপদ ডেকে আনতে পারে। ঠিক যে সময়ে মিশন কন্ট্রোল তাদের ম্যানুয়ালে আঁতিপাঁতি করে ১২০২ এরর কোডের মানে খুঁজে চলছে। এর মধ্যেই দ্বিতীয় আরেকটি বিপদ সংকেত বেজে উঠল ঈগলে। মিশন কন্ট্রোলের তখন তীব্র উত্তেজনায় মাথার চুল ছেঁড়ার জোগাড়। কিন্তু কোনো সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না।

ঈগলের সারি সারি কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে অলড্রিন যখন বোঝার চেষ্টা করছেন, বিপদ সংকেতটা কম্পিউটার সফটওয়্যারের কোনো ত্রুটি কি না, তখন আর্মস্ট্রং পড়েছেন আরেক বিপদে। বিপদ সংকেত নিয়ে দুজনের উৎকণ্ঠা আর ব্যস্ততার মধ্যেই তাঁদের আগে থেকে নির্ধারিত অবতরণস্থান থেকে বেশ কিছুটা পেরিয়ে গেছেন তাঁরা। নিচে এখন যে জায়গা দেখা যাচ্ছে– সেখানে নামলে চাঁদের মাটিতে ঈগল আছড়ে পড়ে বিধ্বস্ত হবে। তাতে চাঁদের বুকে স্রেফ ছাতু হয়ে যাবেন তাঁরা দুজন। মিশন কন্ট্রোল থেকে এসময় জানালো হলো তাঁদের কম্পিউটার ওভার লোড হয়ে গেছে। অনেক তথ্য নিয়ে কাজ করতে গিয়েই এটা হয়েছে। এটা ঈগলের যান্ত্রিক কোনো সমস্যা নয়।

অলড্রিন ঘোষণা করে যাচ্ছেন– 'সাতশ ফুট (২১০ মিটার)' তফাতে থেকে চাঁদের পৃষ্ঠ হতে তাঁদের দূরত্ব বোঝাচ্ছেন তিনি। 'একুশ করে নেমে আসছে।' এর অর্থ হচ্ছে– প্রতি সেকেন্ডে এই দূরত্ব ২১ ফুট বা ৬ মিটার করে কমে আসছে। যে স্থানটিতে তাঁরা নামবেন, আর্মস্ট্রং তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু ঐ জায়গাটা তাকে খুশি করতে পারল না। ফুটবল মাঠের সমান এক আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, আশে-পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিশাল আকৃতির কিছু পাথরের টুকরো। এর কোনো কোনোটি আস্ত একটি গাড়ির সমান। এখানে যদি ঈগল নামে– তবে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আর্মস্ট্রং ঈগলের নামার গতি কমিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে জ্বালামুখটি পেরিয়ে এলেন। আর্মস্ট্রং একটি নিরাপদ অবতরণ কেন্দ্র খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। অলড্রিন অবশ্য শীতল কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন- ১০০ মিটার চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে। আর জ্বালানি আছে ৬০ সেকেন্ডের। আর্মস্ট্রং ঈগলের জানালা দিয়ে অবতরণের জন্য একটি জায়গা তড়িঘড়ি করে ঠিক করে ফেললেন। নামার জন্য আর মাত্র ৩০ সেকেন্ডের জ্বালানি বাকি থাকতেই ঈগল চাঁদের ধূসর বুকে মোটামুটি মসৃণ এক জায়গায় অবতরণ করতে শুরু করল। মাটির কাছে যেতে না যেতেই ঈগলের ইঞ্জিন থেকে তীব্র বেগে বেরিয়ে আসা গ্যাসের ধাক্কায় চারদিকে চাঁদের ধুলো ধূসরিত হয়ে ওঠল।

শেষ কয়েক মিটার অবতরণে ঈগলের ভাগ্যে কী ঘটল– সে বিষয়ে পুরোটাই অন্ধকারে রইলেন নীল আর বাজ। তাঁরা কি আদৌ চাঁদের মাটিতে নামতে পেরেছেন? চাঁদের মাটিতে ঈগলের পা যদি নিরাপদে অবতরণ করে– তাহলে কন্ট্রোল প্যানেলে নীলরঙা কন্টাক্ট লাইট জ্বলার কথা। সে আলো জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় রইলেন দুই অভিযাত্রী। কয়েক সেকেন্ড সময়কেও তাঁদের কাছে অনন্তকাল বলে মনে হলো। অবশেষে নীলরঙা আলো জ্বলে উঠল। মানে ঈগল শেষ পর্যন্ত চাঁদের মাটিতে নামতে পেরেছে। হেলমেটের ভেতর দিয়ে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন একে অপরের দিকে তাকিয়ে শুকনো হেসে–হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য।

আর্মস্ট্রং হাত বাড়িয়ে তাঁর মাইক্রোফোন চালু করলেন। 'হিউসটন, শান্ত সাগর থেকে বলছি ঈগল সফলভাবে অবতরণ করেছে।' সে সময় গোটা মিশন পরিচালনা কেন্দ্র ফেটে পড়ল উল্লাস ধ্বনিতে। বাংলাদেশ সময় তখন ২১ জুলাই ১৯৬৯, রাত সোয়া দুইটা। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সময় তখনো ২০ জুলাই।

আগে থেকেই ঠিক করা ছিল– চাঁদে অবতরণের পর তাঁরা পাঁচ ঘন্টা ঘুমিয়ে নিবেন। তারপর নামবেন চাঁদের ভূমিতে। কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টির এত কাছে এসে চোখে কি আর ঘুম আসে? দু চোখের পাতা এক করতে পারলেন না দুই অভিযাত্রী। মিশন পরিচালনা কেন্দ্র তাঁদের ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁরা পোশাক পরে তৈরি হলেন। অবশ্য পোশাক পরতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। কারণ আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন যে পোশাক পরে নেমেছিলেন তাতে মোট বাইশটি স্তর ছিল। এটি রক্ষা করেছে চাঁদের অতিরিক্ত শৈত্য থেকে। কারণ চাঁদের তাপমাত্রা রাতে থাকে –১৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা বাড়তে বাড়তে দিনে দাড়ায় ১৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। এ স্যুটের বাইরের স্তরটি বেশ সহনশীল। এ স্তরটি মূলত– চাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কা কণা থেকে অভিযাত্রীদের রক্ষা করেছে। এইসব ধুলোকণা এত প্রচণ্ড গতিতে চাঁদপৃষ্ঠে ছুটোছুটি করে যে– যে কোনোও মানুষের অরক্ষিত দেহ ফুটো করে বেরিয়ে যেতে পারে।
অলড্রিন দরজা খুলে দিলেন। আর্মস্ট্রং সিড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। লাখো জনতা টেলিভিশনে এই দৃশ্য দেখছেন। সাদা স্পেসস্যুট পরিহিত একজন মানুষ মইয়ের নয়টি ধাপের শেষ ধাপে এসে একটু থেমেগেলেন। আর্মস্ট্রং একটু কি ভয় পেলেন? হাজার হোক পৃথিবীর বাইরে অচেনা-অজানা জায়গা বলে কথা। অজানা এক ভয় পাচ্ছিলেন টিভি সেটের সামনে বসে থাকা দর্শকেরাও।



চাঁদের মাটিতে নেমে যদি সত্যিই কোনো ভয়ংকর বিপদ ঘটে, তাহলে কী হবে? যদি নভোযান পুরোপুরি বিকল হয়ে যায়? তাঁরা আর কোনো দিন যদি পৃথিবীতে ফিরে আসতে না পারে? তাঁদের পিঠের অক্সিজেনের সিলিন্ডার ব্যবহার করে সর্বোচ্চ কয়েক ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারবেন। এমন বিপদের আশংকা– অভিযানের অনেক আগেই ভেবে রেখেছিল নাসা ও মার্কিন প্রশাসন। সে জন্য পৃথিবী থেকে খ্রিষ্টধর্মমতে নীল আর বাজের

মহাকাশীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একজন পাদরিকে ঠিক করে রাখা হয়েছিল। এ বিপদের আশঙ্কা নভোচারীরাও করেছিলেন। নভোচারীরা বিমার পদ্ধতিগত কারণে জীবনবিমা করতে পারেননি। তাই তাঁরা তাঁদের ফটোগ্রাফ সই করে পরিবারের কাছে রেখে যান। দুর্ঘটনা ঘটলে ফটো নিলামে তুলে যেন কিছু অর্থ পাওয়া যায়। মজার ব্যাপার হলো, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন দুর্ঘটনা নিহতদের জন্য টেলিভিশনে তাৎক্ষণিক জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য এক টিভি ভাষণ রেকর্ড করে রেখেছিলেন।

সৌভাগ্যই বলতে হবে– ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত টিভিতে সম্প্রচারের প্রয়োজন পড়েনি। আর্মস্ট্রং সন্তর্পণে এক পা চাঁদের উপর রেখে পরীক্ষা করে দেখলেন মাটি নরম কিনা, পা পিছলে বা বসে যাবে কিনা। তারপর লাফ দিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠ বেশ নিরাপদেই পা রাখলেন। দৃঢ় ও স্থির গলায় তিনি বলে উঠলেন– 'দ্যাটস ওয়ান স্মল স্টেপ ফর ম্যান, ওয়ান জায়ান্ট লিপ ফর ম্যানকাইন্ড।' ব্যাস চাঁদের মিহি ধুলোয় নিজের পায়ের ছাপ এঁকে দিলেন নীল। এর মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠলেন চাঁদের মাটিতে পা রাখা প্রথম মানুষ।

আর্মস্ট্রং প্রথমে কিছু মাটি ও পাথর তার স্পেসস্যুটের পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন। কোনো কারণে যদি চাঁদে বেড়ানোর সময় কমিয়ে দেয়া হয়। তারপর অন্তত পৃথিবীতে মূল্যবান কিছু পদার্থ নিয়ে আসতে পারবেন। পনেরো মিনিট পরে, অলড্রিন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। 'অসাধারণ দৃশ্য! তাই না?' আর্মস্ট্রংকে জিজ্ঞেস করলেন অলড্রিন। 'বিষাদাচ্ছন্ন কিন্তু চমৎকার'– উদ্বিগ্ন চোখে চারদিকে তাকিয়ে অলড্রিন বললেন।

আলো ও নিকষ অন্ধকারের এই দৃশ্য তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছিলেন। যতদূর চোখ যায় শুধু ধূসর ও তামাটে রঙের বস্তু। অলড্রিন ফিরে তাকালেন পৃথিবীর দিকে। তাঁর মনে হলো, এ যেন দূরের আকাশে ঝলমলে কোনো মরুদ্যান– হাতছানি দিয়ে ডাকছে।



চাঁদের বুকে বাজ অলড্রিন

চাঁদে নেমে কখন কী করতে হবে, তা আগেই নির্ধারিত ছিল। তাই হাতে সময় খুব কম। বেশিক্ষণ চাঁদে থাকা যাবে না। হাতে অনেক কাজ। তাই এক মুহূর্ত দেরি না করে কাজে

নেমে পড়লেন নীল আর বাজ। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যন্ত্রপাতি বসান চাঁদের মাটিতে। আর্মস্ট্রং ক্যামেরাটা বসালেন– যাতে পৃথিবীর মানুষ তাঁদের কাজ দেখতে পায়। চাঁদে মানুষের প্রথম পা রাখার ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে চন্দ্রপৃষ্ঠে একটি ধাতব ফলকও স্থাপন করলেন। ফলকটিতে খোদাই করে লেখা– 'পৃথিবীর মানুষেরা চাঁদের এখানে প্রথম পা রেখেছিলেন জুলাই ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে, আমরা সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছিলাম।' এসব ছাড়াও অ্যাপোলো-১ অভিযানে নিহত হতভাগ্য তিন অভিযাত্রীর স্মরণে চাঁদের মাটিতে রাখা হয় তাঁদের ব্যবহৃত পোশাকের অংশ। আর ছিল দুটি মেডেল। মেডেল দুটি ছিল রুশ নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন ও ভ্লাদিমির কোমারভের। এ ছাড়া রাখা হয় সিলিকন ডিস্ক ও জলপাই গাছের ডাল। সিলিক ডিস্কে খোদাই করে রাখা হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার, কেনেডি, জনসন, নিক্সন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানসহ ৭৩জন বিশ্বনেতার বাণীসহ স্বাক্ষর ছিল। আর শান্তির প্রতীক হিসেবে রাখা হয়েছিল জলপাইয়ের ডাল।

ক্রমেই ফেরার সময় ঘনিয়ে আসছে। তাই এবার চাঁদ থেকে স্মারক হিসেবে তড়িঘড়ি করে তুলে নেন প্রায় ২২ কিলোগ্রাম ওজনের চাঁদের পাথর ও মাটি। এমন সময় মিশন পরিচালনা কেন্দ্র থেকে খবর এল– তাঁদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কথা বলতে চান।
আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁর ডাইরিতে সেদিন লিখলেন- 'এটা ছিল মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক টেলিফোন কল।' এরপর আবার তাঁরা কাজে ফিরে গেলেন। চাঁদের বুকে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পোঁতার সিদ্ধান্তটিও নিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। তাই এবার পতাকা স্থাপনের পালা। চাঁদের বাতাস নেই। কাজেই সেখানে পতপত করে পতাকা উড়বে না। সে কারণে আগে থেকেই পতাকায় কড়া মাড় দিয়ে কড়কড়ে করে নিয়ে আসা হয়েছিল। আবার পর্দার মতো টানটান করে রাখার জন্য দুদিকে দুটো রডও ছিল। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও শেষ পর্যন্ত সেই পতাকাকে চাঁদের মাটিতে অনড় রাখা যায়নি। চাঁদের পৃষ্ঠ খুবই শক্ত ছিল। তাই অনেক চেষ্টা করে পতাকার দণ্ডটিকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি পুঁততে পেরেছিলেন তাঁরা। ঈগল চাঁদের মাটি ছেড়ে যাওয়ার সময় ইঞ্জিন থেকে প্রবল বেগে বেরিয়ে আসা গ্যাসের ধাক্কায় সে পতাকা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।



চাঁদের মাটিতে প্রায় দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে তাঁদের। চাঁদে অবস্থান করার সময় ফুরিয়ে এসেছে। নীল ও বাজ ঈগলে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এবার তাঁদের গন্তব্য চাঁদের কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান কমান্ড মডিউল। সেখানে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন মাইকেল কলিন্স। পৃথিবীর লাখো মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, এমনকি কলম্বিয়ায় বসে থাকা মাইকেল কলিন্সও। নীল বা বাজ চাঁদে থাকার সময় কলিন্স চাঁদকে ১৪ বার প্রদক্ষিণ করে ফেলেছেন। প্রতিটি প্রদক্ষিণে সময় লেগেছে ৪৮ মিনিট করে। এই সময়টুকু তিনি কাটিয়েছেন পুরোপুরি একা, এমনকি তাঁর সাথে কারও রেডিও যোগাযোগও ছিল না। তবে তার নিঃসঙ্গ লাগছিল না। চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে ফিরে ঈগল আর কলম্বিয়ার সফল ডকিং হলো। ঈগলের মাঝের প্যাসেজ খুলে দেয়া হলো। চাঁদের মাটি ও পাথর ভর্তি বাক্সটি ঐ প্যাসেজ দিয়ে পাঠিয়ে তাঁরা হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছলেন কমান্ড মডিউলে। পুনরায় মিলিত হলেন কলিন্সের সাথে। উচ্ছসিত-আনন্দঘন মিলন।

সময় এল ঈগলের মুক্তির। এটি সম্ভবত শত বছর ধরে চাঁদকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে যাবে। 'ঈগল' ছোট্ট মহাকাশ যানটিকে ছেড়ে দিতে গিয়ে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল অলড্রিন ও আর্মস্ট্রং-এর। কিন্তু কি করা! একে তো সাথে করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। এর কোনোও তাপ প্রতিরোধক আচ্ছাদন নেই– যা পৃথিবীর আবহাওয়া একে বাঁচাবে।

কলিন্স চাঁদের অভিকর্ষ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রকেট চালু করলেন। তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন পৃথিবীর দিকে। নীল ও বাজ খুব ক্লান্ত। চাঁদে অভিযান শেষে তাঁরা লুনার মডিউলে ঠাণ্ডা ও অস্বস্তিকর একটি রাত কাটিয়েছেন। অ্যাপোলো-১১ যতই পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে, ততই এর গতি বাড়ছে। যেকোনোও মহাকাশ ভ্রমণে সবচেয়ে কঠিন পর্ব হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনরায় ফিরে আসা। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে অ্যাপোলো-১১ এর কমান্ড মডিউলের গতিবেগ দাড়িয়েছিল ২৪,২৪৩ মাইল বা ৩৯,০১০ কিমি.। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ পেরুতে হয়েছে সঠিক কৌণিক পথ দিয়ে। সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষা নেই। হয়ত গোটা মহাকাশযানটাই মহাশূন্যে পথ হারিয়ে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিংবা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতেও পারে। ফিরে আসার সময় ওই সময়টুকুতে অভিযাত্রী ও মিশন পরিচালনা কেন্দ্রের মধ্যেকার রেডিও যোগাযোগ ছিল শ্বাসরুদ্ধকর ভাবে নীরব, অবশ্য মাত্র এক মিনিট। সবাই আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যখন তারা অভিযাত্রীদের গলার স্বর শুনলেন। এরপর তিনটি প্যারাস্যুট খুলে গেল এবং ঘন্টায় প্রায় ২১ মাইল মানে ৩৪ কিমি. বেগে নেমে আসতে লাগল। তার কিছু পরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তাঁরা নেমে আসেন তিনটি প্যারাস্যুটে ভর করে। যেখানে মার্কিন উদ্ধার জাহাজ 'হর্নেট' আগে থেকেই পস্তুত ছিল উদ্ধারের জন্য। অবশ্য চাঁদের বুকে থেকে কোনো অজানা জীবাণু তাঁদের সঙ্গে এসেছে কি না, তা পরীক্ষা করতে একটি বদ্ধ ঘরে তাঁদের তিন সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। যেমনটি করোনা মহামারিতে সন্দেহভাজনদের দুই সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। এরপর দেশে ফিরে বীরের সম্মান পেলেন তাঁরা। এরপর তাঁরা বিশ্বভ্রমণে বের হন। তাঁরা সফর করেন ২৩ টি দেশের ২৭ টি শহর। তাঁদের সেই ভ্রমণ তালিকায় ঢাকা শহরও ছিল।



এরপর আরও পাঁচবার চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছে নাসা। তাতে চাঁদের বুকে পা রেখেছেন আরও ১০ জন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মনে রাখে প্রথমকেই। তারপর হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায় চাঁদে অভিযান। একবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষ চাঁদের চেয়ে মঙ্গলের দিকেই বেশি আগ্রহী। সবকিছু ঠিক-ঠাক থাকলে ১৯ বছর বয়সী এলিজা কার্সন মেয়েটি হবে লাল রঙের মঙ্গল গ্রহে পা রাখা প্রথম মানুষ। যেহেতু এলিজা মঙ্গলে গিয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম তাই নাসার কাছে সে যৌনতা, বিয়ে বা সন্তান ধারণের নিষেধাজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেছেন।

২০৩৩ সালে যখন মঙ্গল গ্রহে প্রথমবার মানুষ পাঠানোর অভিযান শুরু হবে, তখন এলিজার বয়স হবে ৩২, যা একজন নভোচারীর জন্য যথাযথ বয়স। এলিজার পর আরও মানুষ হয়ত একদিন মঙ্গল গ্রহে যাবে। সেখানে গড়ে ওঠবে মানুষের দ্বিতীয় নিবাস। শুরু হবে মানবসভ্যতার এক নতুন অধ্যায়। আমরা সেই সোনালি দিনের অপেক্ষায়।



তথ্যসূত্র :

১। চন্দ্রজয়ের ৫০ বছর – আবুল বাসার।
২। ফার্স্ট অন দ্যা মুন – মূল বারবারা হেনার (অনুবাদ বাবুই সালসাবিল)।
৩। বিজ্ঞান চিন্তা।
৪। ছোটদের বুক অব নলেজ- দেব সাহিত্য কুটীর (কলিকাতা)।

লেখক:
জহুরুল হক বুলবুল
বিভাগীয় প্রধান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ,কালিহাতী কলেজ, টাঙ্গাইল।

জেমস ওয়াটসন : ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের সহ-আবিষ্কারক

নিশাত বেগম

জেমস ওয়াটসন ছিলেন একজন আমেরিকান আণবিক জীববিজ্ঞানী যিনি ফ্রান্সিস ক্রিকের সাথে সম্মিলিতভাবে ১৯৫৩ সালে ডিএনএর ডাবল-হেলিক্স কাঠামো আবিষ্কারের কৃতিত্ব পান। এই যুগান্তকারী আবিষ্কার, যা জিনতত্ত্বের মৌলিক ধারণাকে পরিবর্তন করেছিল এবং আধুনিক জীববিজ্ঞানের যুগের সূচনা করেছিল, ১৯৬২ সালে (মরিস উইলকিন্সের সাথে সম্মিলিতভাবে) তাঁকে শারীরবিদ্যা (Physiolog) বা চিকিৎসাবিদ্যায় (Medicine) নোবেল পুরস্কার এনে দেয়।

তাঁর জীবন এবং কর্মক্ষেত্রের একটি বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হলো:

প্রাথমিক জীবন এবং শিক্ষা

জন্ম: জেমস ডিউই ওয়াটসন ১৯২৮ সালের ৬ এপ্রিল শিকাগোতে ইলিনয় শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসায়ী জেমস ওয়াটসন এবং তার স্ত্রী জিনের একমাত্র পুত্র। ছোটবেলায়, তিনি এবং তার বাবা প্রায়শই পাখি দেখতে যেতেন, যা অবশেষে জেনেটিক্স সম্পর্কে ওয়াটসনের কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলে।

শিক্ষা: তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যায় বিএসসি (১৯৪৭) ডিগ্রি লাভ করেন এবং ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় ব্লুমিংটন (Indiana University Bloomington) (১৯৫০) থেকে প্রাণিবিদ্যায় পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন, সালভাদর লুরিয়া তাঁর মেন্টর (mentor) ছিলেন।

পরিবার: ওয়াটসন এবং এলিজাবেথ লুইস ১৯৬৮ সালে বিয়ে করেন। তাদের দুই পুত্র ছিল, রুফাস রবার্ট ওয়াটসন (জন্ম ১৯৭০) এবং ডানকান জেমস ওয়াটসন (জন্ম ১৯৭২)।

ওয়াটসন মাঝে মাঝে তার ছেলে রুফাসের কথা বলতেন, যার সিজোফ্রেনিয়া রোগ ছিল। মানসিক অসুস্থতার বোধগম্যতা এবং চিকিৎসায় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য জিনগত দিকগুলি কীভাবে এতে অবদান রাখতে পারে ওয়াটসন তা নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি

ডিএনএ আবিষ্কার (১৯৫৩): ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময়, ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক তাদের সহকর্মী রোজালিন্ড ফ্ল্যাঙ্কলিন এবং তাঁর ছাত্র রেমন্ড গসলিং (তাদের এই বিষয়ক জ্ঞান বা যথাযথ প্রাথমিক স্বীকৃতি ছাড়াই) দ্বারা সংগৃহীত এক্স-রে বিবর্তন (X-ray diffraction) তথ্য ব্যবহার করে ডিএনএর ভৌত এবং রাসায়নিক গঠন নির্ধারণের জন্য ডাবল-হেলিক্স মডেল প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁদের এই নির্দিষ্ট বেস পেয়ারিংসহ একটি দ্বিতল সর্পিল সিঁড়ির মডেল ব্যাখ্যা করেছিল যে কীভাবে জিনগত তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রতিলিপি তৈরি হয়।

নোবেল পুরস্কার:

১৯৬২ সালে, ওয়াটসন, ক্রিক এবং উইলকিন্স এই আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা ডিএনএ-এর গঠন এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদের আবিষ্কার - আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে এর তাৎপর্যের দিক থেকে মেন্ডেল এবং ডারউইনের আবিষ্কারের মত সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ক্যারিয়ারের উল্লেখযোগ্য দিক

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়: ওয়াটসন ১৯৫৬ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত জীববিজ্ঞান পড়িয়েছিলেন।

কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরি (CSHL): ১৯৬৮ সালে পরিচালক পদে দায়িত্ব পাওয়া ওয়াটসন ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে অবস্থিত CSHL-এর পরিচালক, সভাপতি এবং পরবর্তীতে চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে, ল্যাবরেটরিটি ক্যান্সার এবং স্নায়বিক রোগের একটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়।

হিউম্যান জিনোম প্রকল্প: ওয়াটসন ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ন্যাশনাল সেন্টার ফর হিউম্যান জিনোম রিসার্চের প্রথম পরিচালক ছিলেন, যেখানে তিনি হিউম্যান জিনোম প্রকল্প প্রতিষ্ঠা এবং নেতৃত্ব দিতে সহায়তা করেছিলেন। নতুন এনআইএইচ পরিচালক বার্নাডাইন হিলির সাথে জিন সিকোয়েন্সের পেটেন্টিং নিয়ে দ্বন্দ্বের পর তিনি পদত্যাগ করেন, যুক্তি দেন যে তথ্যটি সর্বজনীনভাবে উন্মুক্ত হওয়া উচিত। এই পদে তিনি ১০ এপ্রিল, ১৯৯২ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ওয়াটসন ছিলেন মানব জিনোমের মানচিত্র তৈরির প্রচেষ্টার একজন প্রাথমিক সমর্থক এবং নেতা, যা জেনেটিক্সে তার প্রভাবকে আরও দৃঢ় করে তোলে।

পুরস্কার এবং সম্মাননা

ওয়াটসন অসংখ্য পুরস্কার জিতেছেন যার মধ্যে রয়েছে:



১৯৫৯ - জৈবিক রসায়নে এলি লিলি পুরস্কার (Eli Lilly Award in Biological Chemistry);
১৯৬০ - মৌলিক চিকিৎসা গবেষণার জন্য অ্যালবার্ট লস্কর পুরস্কার (Albert Lasker Award);
১৯৬২ - শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার (Nobel Pri ze in **Physiology or Medicine**);
১৯৭৭ - রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতা পদক (**Presidential Medal of Freedom**);
১৯৮৫ - EMBO সদস্যপদ;
১৯৮৬ - আমেরিকান একাডেমি অফ অ্যাচিভমেন্টের গোল্ডেন প্লেট পুরস্কার (Golden Plate Award of the American Academy of Achievement);
১৯৯৩ - রয়েল সোসাইটির কোপলি পদক (Copley Medal);
১৯৯৭ - জাতীয় বিজ্ঞান পদক;
২০০০ - লিবার্টি পদক;
২০০১ - বিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য বেঞ্জামিন ফ্যাঙ্কলিন পদক (Benjamin Franklin Medal);
২০০২ - গেয়ার্ডনার ফাউন্ডেশন (Gairdner Foundation) আন্তর্জাতিক পুরস্কার;
২০০২ - ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্ডার অফ দ্য অর্ডার (KBE) (Honorary Knight Commander of the Order of the British Empire);
২০০৫ - রয়েল আইরিশ একাডেমির সম্মানসূচক সদস্য;
২০০৫ - ওথমার (Othmer) স্বর্ণপদক;
২০০৮ - CSHL ডাবল হেলিক্স পদক (Honoree);
২০১০ - হেস্টিংস সেন্টারের (the Hastings Center) সম্মানিত ফেলো, একটি

স্বাধীন জৈবনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান;
২০১১- আইরিশ আমেরিকা হল অফ ফেম, মার্চ ২০১১ সালে অন্তর্ভুক্ত;
২০১১ - ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস থেকে আণবিক জীববিজ্ঞানে জন জে. কার্টি পুরস্কার (John J. Carty Award)।

জীবনের রহস্য আবিষ্কার

১৯৫৩ সালের বসন্তে, ওয়াটসন এবং তার সহযোগী আণবিক জীববিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক ব্রিটিশ জার্নাল নেচারে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের মোচড়ানো মইয়ের ডাবল-হেলিক্স কাঠামো (twisting ladder double-helix structure of deoxyribonucleic acid) বর্ণনা করেছিলেন যা এখন সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে । এটিই প্রথমবারের মতো ঘটেছিলো যে কেউ ডিএনএ অণুকে এমনভাবে দেখেছিল, যা মানুষসহ প্রতিটি জীবের জিনগত তথ্য বহন করে এবং এটি আমাদের বিবর্তনীয় উৎপত্তি থেকে শুরু করে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রোগ পর্যন্ত সবকিছু সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় বিপ্লব এনে দেয়।



কয়েক দশক পরে ওয়াটসন দাবি করেন তিনি শতাব্দীর সেরা আবিষ্কারটি করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, "হঠাৎ করে বংশগতির জন্য দায়ী এবং যা মানুষের অস্তিত্বকে সম্ভব করে তোলে, সেই অণুটি দেখা মানুষের নিজেকে বোঝার ক্ষেত্রে একটি খুব বড় পদক্ষেপ ছিল। ঠিক একই অর্থে ডারউইন জানতেন যে মানব প্রজাতি স্থির নয়, আমরা পরিবর্তনশীল। এটি অবশ্যই সবকিছুর প্রতি আপনার মনোভাবকে প্রভাবিত করবে।"

ওয়াটসনের বিতর্কিত মন্তব্য এবং পরবর্তী জীবন

ওয়াটসন তাদের আবিষ্কার সম্পর্কে তাঁর বই "দ্য ডাবল হেলিক্স" লিখার শুরু করেছিলেন এই মন্তব্য দিয়ে যে, "আমি কখনও ফ্রান্সিস ক্রিককে বিনয়ী মেজাজে দেখিনি", যদিও ওয়াটসন নিজে কখনও নম্রতা বা বিনয়ী কৌশলের জন্য পরিচিত ছিলেন না। জেনেটিক্স, জাতি (race) এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বারবার জনসমক্ষে বিতর্কিত মন্তব্যের মাধ্যমে ওয়াটসনের খ্যাতি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেগুলিকে বর্ণবাদী, যৌনতাবাদী এবং অবৈজ্ঞানিক বলে ব্যাপকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ২০০৭ সালের একটি সাক্ষাৎকারে এবং ২০১৯ সালের অন্য একটি তথ্যচিত্রে, তিনি তাঁর অপ্রমাণিত মতামত পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন যে কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদের বুদ্ধিমত্তার মধ্যে জেনেটিক পার্থক্য রয়েছে। এই মন্তব্যগুলির ফলে কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরি ২০১৯ সালে তার সম্মানসূচক উপাধি প্রত্যাহার করে এবং তার সাথে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। ওয়াটসনের পরবর্তী বছরগুলি তাঁর বিতর্কিত মন্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যার ফলে ব্যাপক নিন্দার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি ছিলেন প্রথম নোবেল বিজয়ী যিনি ২০১৪ সালে জীবিতাবস্থায় তাঁর পদক নিলামে তুলেছিলেন, যা পরে ক্রেতা ফেরত দিয়েছিল।

ধর্ম: ওয়াটসনের মা ছিলেন একজন বিনয়ী ধার্মিক ক্যাথলিক এবং তাঁর বাবা একজন এপিস্কোপ্যালিয়ান যিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। ওয়াটসন ক্যাথলিক হয়ে বেড়ে ওঠেন, কিন্তু পরে তিনি নিজেকে ক্যাথলিক ধর্ম থেকে পলাতক হিসেবে বর্ণনা করতেন। ওয়াটসন বলেন, "আমার সাথে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে ভালো ঘটনা হল যে

আমার বাবা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না।" ১১ বছর বয়সে, ওয়াটসন প্রার্থনায় যোগদান বন্ধ করে দেন এবং বৈজ্ঞানিক ও মানবতাবাদী জ্ঞানের সাধনা করেন।

বইঃ ওয়াটসন অনেক বিজ্ঞানের বই লিখেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে পাঠ্যপুস্তক "মলিকুলার বায়োলজি অফ দ্য জিন" (১৯৬৫)- "The textbook Molecular Biology of he Gene" এবং তার সর্বাধিক বিক্রিত বই "দ্য ডাবল হেলিক্স" (১৯৬৮)- "The Double Helix"। ওয়াটসন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের সাথে যুক্ত থেকে হিউম্যান জিনোম প্রকল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিলেন, যা ২০০৩ সালে মানব জিনোম ম্যাপিংয়ের কাজ সম্পন্ন করেছিল।

মৃত্যুঃ ওয়াটসন তার মন্তব্যের জন্য তীব্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ ও জনজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ সময়গুলি জেমস ওয়াটসনের জন্য অনেক কঠিন ছিল। যদিও তিনি আণবিক জীববিজ্ঞানের একজন পথিকৃৎ ছিলেন, যার কাজ আধুনিক জেনেটিক্সের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, কিন্তু তাঁর পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি এই খ্যাতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ম্লান করে দিয়েছিল। সংক্রমণের চিকিৎসার পর হসপিস কেয়ারে স্থানান্তরিত হওয়ার এক সপ্তাহ পর, ২০২৫ সালের ৬ নভেম্বর নিউ ইয়র্কের পূর্ব নর্থপোর্টে ওয়াটসন মারা যান। এই সময় তাঁর বয়স ছিল ৯৭ বছর। তাঁর মৃত্যুর পর, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস ওয়াটসনকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী হিসেবে অভিহিত করে এবং তার বর্ণগত দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে থাকা বিতর্ককেও স্বীকার করে। বিবিসি উল্লেখ করেছে যে ওয়াটসনের কাজগুলি "আণবিক জীববিজ্ঞানে দ্রুত অগ্রগতির ক্ষেত্র তৈরি করার পাশাপাশি ডিএনএ কীভাবে প্রতিলিপি তৈরি করে এবং জেনেটিক তথ্য বহন করে তা ব্যাখ্যা করার দ্বার খুলে দিয়েছে"।

তথ্যসূত্রঃ

1.James Watson - Wikipedia

2.James Watson, co-discoverer of DNA double helix, dies at 97 | National Geographic

3.James Watson – Biographical - NobelPrize.org

4.James Watson, Nobel Laureate Who Co-Discovered DNA Structure, Dies at 97 | The Scientist

5.https://www.bbc.com/news/articles/cyr70zznpjxo

6.James Watson, co-discoverer of the shape of DNA and Nobel Prize winner, dies at 97 - CBS News

7.Watson, James (March 25, 2016). "Nobel Scientist: I Place My Faith in Human Gods"

8.Discover Dialogue: Geneticist James Watson". Discover. July 2003. The luckiest thing that ever happened to me was that my father didn't believe in God

9.Watson, James (March 25, 2016). "Nobel Scientist: I Place My Faith in Human Gods". TIME. Retrieved July 30, 2024.

10.Dean, Cornelia (November 7, 2025). "James Watson, Co-Discoverer of the Structure of DNA, Is Dead at 97". The New York Times. Retrieved November 7, 2025.

11. "DNA pioneer James Watson dies at 97". BBC. November 7, 2025. Retrieved November 7, 2025.

লেখকঃ
নিশাত বেগম
সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ
গফরগাঁও সরকারি কলেজ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

বাংলাদেশের বহুল পরিচিত দশটি গায়ক পাখি

সুমন মণ্ডল

ভূমিকা

বাংলাদেশের আকাশ, বন, মাঠ, নদী ও গ্রামবাংলার সকাল-সন্ধ্যা পাখির কণ্ঠস্বর ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। ভোরের আলো ফুটতেই দোয়েলের মিষ্টি ডাক, দুপুরে শালিকের কিচিরমিচির, আবার গোধূলিতে ফিঙের তীক্ষ্ণ স্বর–সব মিলিয়ে এ দেশের প্রকৃতি যেন গানের তালে তালে নেচে ওঠে। পাখিরা শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য বাড়ায় না, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও অপরিহার্য ভূমিকা রাখে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণির পাখি আছে, যারা শুধু উড়তেই পারে না–গান গাইতেও পারে! এই গায়ক পাখিরা (songbirds) প্রকৃতির সঙ্গীতশিল্পী, যাদের কণ্ঠে আমরা পাই মুগ্ধতা, প্রেম ও প্রকৃতির সজীবতার অনুভূতি।

বিশ্বে প্রায় ৪,০০০ প্রজাতির গায়ক পাখি রয়েছে, আর বাংলাদেশে প্রায় ৪৫০ প্রজাতির পাখির মধ্যে অন্তত ১০০টির বেশি গায়ক বা সুরেলা স্বরের জন্য পরিচিত। তবে এই প্রবন্ধে বেছে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে পরিচিত, সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও সুরধ্বনির জন্য খ্যাত দশটি গায়ক পাখি।

এদের পরিচয়, জীবনযাপন, প্রজনন, খাদ্যাভ্যাস, সংরক্ষণ অবস্থা এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. দোয়েল (Oriental Magpie Robin – *Copsychus saularis*)





দোয়েল বাংলাদেশের জাতীয় পাখি। এই ক্ষুদ্র গায়ক পাখিটি গ্রামীণ আঙিনা থেকে শুরু করে নগরীর বাগান পর্যন্ত সর্বত্র দেখা যায়। কালো-সাদা পালকের ছোট পাখি, পুরুষটি বেশি চকচকে কালো এবং স্ত্রীটি হালকা ধূসর। লেজ তুলনামূলক লম্বা, ডানায় সাদা দাগ স্পষ্ট। দোয়েল মাটিতে পোকা, শুঁয়োপোকা, ছোট ফল ও শস্য খায়। এরা গর্ত বা ঘরের কোণে বাসা বাঁধে।

পরিচিতি

- বর্গ: Passeriformes
- পরিবার: Muscicapidae
- বৈজ্ঞানিক নাম: *Copsychus saularis*
- IUCN অবস্থা: Least Concern

গান ও স্বরধ্বনি

এরা একেবারে আসল গায়ক পাখি–বিভিন্ন সুরে ডাকতে পারে, এমনকি অন্য পাখির ডাক অনুকরণ করতেও পারে। ভোরবেলা এর গান শুরু হয়, যা কখনো কখনো ১০-১৫ মিনিট ধরে চলে। গ্রীষ্ম ও প্রজনন মৌসুমে এদের গান সবচেয়ে সুরেলা ও জোরালো হয়।

সাংস্কৃতিক প্রভাব

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক হিসেবে দোয়েল আমাদের সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত। ডাকটিকিট, মুদ্রা, এমনকি ভাস্কর্যেও (দোয়েল চত্বর) এই পাখির উপস্থিতি রয়েছে।

২. বুলবুলি (Red-vented Bulbul *Pzcnonotus cafer*)





অন্যান্য নাম- বুলবুল, টগা, ঝুটকুলু বাংলাদেশের গ্রাম থেকে শহর, বাগান থেকে জঙ্গল সবখানেই বুলবুলির কণ্ঠস্বর শোনা যায়। বুলবুলের মাথায় কালো ঝুঁটি, শরীর বাদামী ও লেজের নিচে লালচে অংশ (রেড ভেন্ট)। এদের চেহারায় একটা গাম্ভীর্য আছে। এরা গাছের ডালে, গুল্মে বা বাঁশঝাড়ে বাসা বানায়। ফল, ফুলের মধু, ও ছোট পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে।

পরিচিতি

- বর্গ: Passeriformes
- পরিবার: Pzcnonotidae
- বৈজ্ঞানিক নাম: *Pzcnonotus cafer*
- IUCN অবস্থা: Least Concern

গান ও স্বরধ্বনি

এরা উচ্চস্বরে চুই চুই' বা পিচ্চু পিচ্চু' ধ্বনি তোলে, যা একসাথে কয়েকটি নোটে ওঠানামা করে। ভোর ও বিকেলের দিকে গান শোনা যায় বেশি। এদের গান মধুর, তবে প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী।

সংরক্ষণ ও ভূমিকা

বুলবুল পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। বর্তমানে নগরায়নের ফলে কিছু এলাকায় বাসস্থান কমে গেলেও বাংলাদেশে এখনো সাধারণ প্রজাতি হিসেবে টিকে আছে।

৩. ভাতশালিক (Common Myna - *Acridotheres tristis*)



বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে সবচেয়ে সহজে দেখা যায় যে গায়ক পাখিকে, সেটি হলো শালিক বা ভাতশালিক। ভাতশালিক মাঝারি আকৃতির, বাদামী রঙের শরীর, কালচে মাথা এবং চোখের পাশে হলুদ দাগ দেখে চেনা যায়। এরা দলে দলে থাকে, মানুষের বসতির কাছাকাছি বাস করে। পোকামাকড়, ফল, খাবারের টুকরো–সবই খায়।

পরিচিতি

- বর্গ: Passeriformes
- পরিবার: Sturnidae
- বৈজ্ঞানিক নাম: *Acridotheres tristis*
- IUCN অবস্থা: Least Concern

গান ও স্বরধ্বনি

অন্যান্য ময়নার মত ভাতশালিকদের বিশেষত্ব হলো–এরা অসাধারণ অনুকরণ ক্ষমতা রাখে। মানুষের আওয়াজ, অন্য পাখির ডাক, এমনকি মোবাইলের টোনও অনুকরণ করতে পারে! তাদের কণ্ঠে "চিরিক", "কিরিক", "কিউ-কিউ" ইত্যাদি শব্দে নানা রকম মিশ্র সুর শোনা যায়।

সংরক্ষণ ও সামাজিক ভূমিকা

শালিক পরিবেশে কীটনাশক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হলেও অতি ঘনবসতি এলাকায় খাদ্যের প্রতিযোগিতায় ছোট পাখিদের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে।

৪. ঝুঁটি শালিক (Jungle Myna *Acridotheres fuscus*)



ভাতশালিকের তুলনায় একটু গাঢ় রঙের ও মাথায় ছোট কালো ঝুঁটি থাকে। চোখের চারপাশে হালকা নীলচে ত্বক দেখা যায়। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও আধা-বনাঞ্চলে সাধারণভাবে দেখা যায়। পোকামাকড়, বীজ, ধান ও ফল খায়। কৃষিক্ষেত্রের পোকা দমনে সহায়ক। বসন্তে প্রজনন মৌসুম, গাছের ফাঁপা অংশে বা ঘরের কার্নিশে বাসা বানায়।

পরিচিতি

- বর্গ: Passeriformes
- পরিবার: Sturnidae
- বৈজ্ঞানিক নাম: *Acridotheres fuscus*
- IUCN অবস্থা: Least Concern

গান ও স্বরধ্বনি

এদের স্বর কিছুটা কর্কশ হলেও স্বরনিয়ন্ত্রণ ও সুরের তারতম্যে গায়ক পাখির শ্রেণিতে পড়ে। এরা দলবদ্ধভাবে ডাকে–'চিরি-চিরি-চিরিক' জাতীয় শব্দে।

৫. ফিঙে (Black Drongo *Dicrurus macrocercus*)

কালো ঝকঝকে পালক, দ্বিখণ্ডিত লেজ আর সাহসী চরিত্রের জন্য ফিঙে বাংলাদেশের অন্যতম প্রিয় পাখি। পুরো শরীর চকচকে কালো, মাথা কিছুটা গোলাকার, চোখ উজ্জ্বল লালচে-বাদামী, ঠোঁট মোটা ও কালো, আর লেজটি স্পষ্টভাবে কাঁটা বা কাঁচির মতো দুই ভাগে বিভক্ত। মাদি ও পুরুষ পাখি দেখতে প্রায় অভিন্ন, তবে নবীন পাখিদের পালক তুলনামূলক নিস্তেজ ও বাদামী-ধূসর রঙের হয়।

এর উড়ার ধরণ বেশ তেজী ও নিয়ন্ত্রিত–হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পোকা ধরে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসে, যা একে এক দক্ষ আকাশচারি শিকারি হিসেবে চিহ্নিত করে।

পরিচিতি



- বর্গ: Passeriformes
- পরিবার: Dicruridae
- বৈজ্ঞানিক নাম: *Dicrurus macrocercus*
- ওটঈঘ অবস্থা: Least Concern

গান ও স্বরধ্বনি

ফিঙের ডাক তীক্ষ্ণ, কখনো সুরেলা আবার কখনো সতর্কতামূলক। ভোরবেলা ফিঙের একাকী গান প্রান্তরের নীরবতা ভেঙে দেয়। দাঁড়কাকের ডাক খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ–কখনও তীক্ষ্ণ, কখনও কর্কশ, আবার কখনও সুরেলা। এর কণ্ঠে "চি-রী", "ট্রি-ট্রি", "চি-উই" বা "ট্র্যাচ-ট্র্যাচ" ধরনের শব্দ শোনা যায়। গবেষকরা দেখেছেন, এই প্রজাতি অন্য পাখির ডাকও নকল করতে পারে (mimicry)। ফিঙের গান সাধারণত ভোর ও বিকেলে বেশি শোনা যায়। এরা এলাকা রক্ষার সময় বা প্রজনন ঋতুতে গান গেয়ে অন্যান্য পাখিকে সতর্ক করে।

সাহসিকতা

ফিঙে অন্য বড় পাখি, এমনকি কাক বা শিকারি পাখিকেও তাড়া দেয়–এই কারণে অনেক স্থানে তাকে "পাখিদের রক্ষক" বলা হয়।

পরিবেশগত ভূমিকা

ফিঙে প্রচুর পরিমাণে পোকামাকড় খায়, ফলে কৃষিজমিতে প্রাকৃতিক কীটনাশকের ভূমিকা রাখে।

৬. টিয়া (Rose-ringed Parakeet *Psittacula krameri*)



রঙিন সবুজ পালক ও লাল ঠোঁটের টিয়া বাংলাদেশের পাখিপ্রেমীদের কাছে অতি পরিচিত। ফল, বাদাম, বীজ ও ফুলের মধু এদের প্রধান খাদ্য। এরা গাছের গর্তে বাসা বানায়। টিয়া দলে দলে উড়ে বেড়ায়, একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থাকে। এদের বুদ্ধিমত্তা ও যোগাযোগ ক্ষমতা অসাধারণ।

পরিচিতি
- বর্গ: Psittaciformes
- পরিবার: Psittaculidae
- বৈজ্ঞানিক নাম: *Psittacula krameri*
- IUCN অবস্থা: Least Concern

গান ও স্বরধ্বনি
টিয়া মূলত অনুকরণে পারদর্শী–মানুষের ভাষা, শব্দ এমনকি হাসির আওয়াজও শিখতে পারে। বনে এরা তীক্ষ্ণ ও টানা স্বরে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

৭. টুনটুনি (**Common Tailorbird** *Orthotomus sutorius*)
বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম গায়ক পাখিগুলোর মধ্যে টুনটুনি অন্যতম। পাতায় সেলাই করা বাসা ও মিষ্টি স্বর এ পাখিটিকে আলাদা করে তোলে।



পরিচিতি
- বর্গ: Passeriformes
- পরিবার: Cisticolidae
- বৈজ্ঞানিক নাম: *Orthotomus sutorius*
- IUCN অবস্থা: Least Concern

গান ও স্বরধ্বনি
এরা ভোরবেলা "টিঁ টিঁ টিঁ" ধ্বনিতে ডাকতে থাকে, কখনো একটানা কয়েক মিনিট ধরে। প্রজনন মৌসুমে এদের স্বর আরও সুরেলা হয়।

বাসা বানানোর দক্ষতা
টুনটুনি পাতার কিনারা সুঁই-সুতো সদৃশ তন্তু দিয়ে সেলাই করে ছোট বাসা বানায়–প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি!

পরিবেশগত ভূমিকা
এরা ছোট পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে।

৮. হলদে পাখি বা কালোমাথা বেনেবউ (**Black-hooded Oriole Ñ Oriolus xanthornus**)





বাংলাদেশের অন্যতম আকর্ষণীয় ও রঙিন গায়ক পাখি হলো এই হলদে পাখি। পুরুষ পাখির পুরো দেহ উজ্জ্বল সোনালি-হলুদ, মাথা ও গলা চকচকে কালো। ডানায় কালো

দাগ এবং লেজের নিচে হালকা হলুদাভ ছায়া থাকে। স্ত্রী পাখির রঙ তুলনামূলক হালকা, কিন্তু সৌন্দর্যে কম নয়। এরা গ্রামীণ বাগান, ফলের বাগান, বনপ্রান্ত এবং শহরের বড় বড় গাছেও দেখা যায়। এরা মূলত ফলভোজী (frugivorous), তবে পোকামাকড়ও খায়। ফল পাকলে এদের দেখা মেলে বেশি। বট, ডুমুর, জাম, পাকলাগা কলা–সবই এদের প্রিয়। এরা পোকামাকড়ও শিকার করে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে। মার্চ থেকে জুলাই প্রজননকাল। গাছের ডালের মাঝে কাপ আকৃতির সুন্দর বাসা বানায়, যা শুকনো ঘাস, তন্তু ও গাছের ছাল দিয়ে তৈরি। স্ত্রী পাখি সাধারণত ২৩টি ডিম দেয়। উভয় পাখিই ডিমে তা দেয় ও ছানাকে খাওয়ায়। বাংলাদেশের প্রায় সব বিভাগেই দেখা যায়–বিশেষত ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও বিস্তৃত।

পরিচিতি

- বর্গ: Passeriformes
- পরিবার: Oriolidae
- বৈজ্ঞানিক নাম: *Oriolus xanthornus*
- IUCN অবস্থা: Least Concern

গান ও স্বরধ্বনি

হলদে পাখির কণ্ঠ মধুর, বাঁশির মতো স্বর। এর ডাক সাধারণত "পিহিউ", "পিহিউ" বা "লিউলিউ" ধ্বনিতে শোনা যায়। ভোরবেলা ও বিকেলে এরা সবচেয়ে সক্রিয় থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষ পাখি এলাকা রক্ষা ও সঙ্গী আকর্ষণের জন্য গান গায়, আর স্ত্রী পাখি অপেক্ষাকৃত নীরব থাকে।

সংরক্ষণ

যদিও এখনো সাধারণ প্রজাতি, তবু নগরায়ন, বড় গাছ কাটার প্রবণতা এবং পোষা পাখি ব্যবসা এদের বাসস্থান কমিয়ে দিচ্ছে। ফলবাগান ও পুরোনো বড় গাছ সংরক্ষণ করলে এই সুন্দর গায়ক পাখির সংখ্যা টিকে থাকবে।

৯. গোবরে শালিক (**Asian Pied Starling** *Gracupica contra*)

বাংলাদেশের গ্রামবাংলায় যেসব পাখি সবচেয়ে সহজে চেনা যায়, গোবরে শালিক তাদের অন্যতম। কালো ও সাদা দাগের মিশ্রণে গঠিত এর দেহরঙ আর গালের কমলা দাগ এটিকে করে তুলেছে বেশ আকর্ষণীয়। গ্রাম, শহর, কৃষিজমি–সব জায়গাতেই এরা অভ্যস্ত। বড় গাছের ডালে বা বৈদ্যুতিক খুঁটির গর্তে বাসা বানায়। খাদ্য হিসেবে নেয় পোকামাকড়, ফল, ধান ও ভাতের টুকরো।



পরিচিতি

- বর্গ: Passeriformes
- পরিবার: Sturnidae
- বৈজ্ঞানিক নাম: *Gracupica contra*
- IUCN অবস্থা: Least Concern

গান ও স্বরধ্বনি

গোবরে শালিক দলে দলে উড়ে বেড়ায় এবং সমবেতভাবে গান গায়। এদের ডাক কিছুটা কর্কশ হলেও ছন্দবদ্ধ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রজনন সময় ঘনিয়ে এলে এদের গান অনেক বেশি শোনা যায়।

পরিবেশগত ভূমিকা

পাতিকাক (House Crow Corvus splendens)

পাতিকাক বাংলাদেশজুড়ে সবচেয়ে সাধারণ কাক। শহর, গ্রাম, নদীর ধারে, বাজার, বন্দর–যেখানেই মানুষ আছে, সেখানেই পাতিকাকের উপস্থিতি। এটি এক অর্থে "মানুষনির্ভর" পাখি। পাতিকাক অত্যন্ত সামাজিক ও বুদ্ধিমান। এরা দলে দলে ঘুরে বেড়ায়, খাদ্য অনুসন্ধানে একে অপরকে সহযোগিতা করে। মানুষের কাছ থেকে খাবার চুরি করা বা ঢাকনা খোলা–এদের চাতুর্যের প্রমাণ।



দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক অঞ্চলে এখন এরা ছড়িয়ে পড়েছে। পাতিকাক আকারে মাঝারি, দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০-৪২ সেমি। মাথা, গলা ও বক্ষের অংশ চকচকে কালো, আর ঘাড় থেকে নিচের অংশে হালকা ধূসর আভা দেখা যায়। ঠোঁট ও পা কালো, চোখ গাঢ় বাদামী।

পাতিকাক সর্বভুক (omnivorous)। আবর্জনা, মাছের টুকরো, ফল, পোকা, এমনকি ছোট পাখি বা ডিম পর্যন্ত খেতে পারে। শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এরা কিছুটা ভূমিকা রাখে, কারণ অনেক বর্জ্য খেয়ে পরিষ্কার রাখে পরিবেশকে।

এরা গাছের ডালে শুকনো ডাল, তার, কাপড় ইত্যাদি দিয়ে বড় বাসা বানায়। স্ত্রী কাক সাধারণত ৩৫টি ডিম পাড়ে। উভয় পিতা-মাতা মিলে ডিমে তা দেয় ও বাচ্চাকে খাওয়ায়।

পরিচিতি

- বর্গ: Passeriformes
- পরিবার: Corvidae
- বৈজ্ঞানিক নাম: Corvus splendens
- IUCN সংরক্ষণ অবস্থা: Least Concern

গান ও স্বরধ্বনি

পাতিকাকের ডাক অনেক জোরালো ও কর্কশ – "কা কা কা" ধ্বনিতে। কণ্ঠস্বর কর্কশ হলেও এটি প্রকৃত অর্থে গায়ক পাখি। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এরা স্বর ও ডাক পরিবর্তন করে। সকালের নিরবতা বা বিকেলের আকাশে কাকের দলবদ্ধ ডাক এক ধরনের ছন্দ তৈরি করে, যা গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

পরিবেশগত ভূমিকা ও প্রভাব

একদিকে পাতিকাক বর্জ্য খেয়ে পরিবেশ পরিষ্কারে সাহায্য করে, কিন্তু অন্যদিকে ছোট পাখির ডিম নষ্ট করা, পোকামাকড়ের ভারসাম্য নষ্ট করা ইত্যাদি কারণে কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিকরও হয়ে ওঠে।

উপসংহার

বাংলাদেশের গায়ক পাখিরা শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, তারা আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও জীবনের অংশ। তাদের গান আমাদের ভোর জাগায়, মন প্রফুল্ল করে, আবার প্রকৃতির ছন্দ শেখায়। কিন্তু দ্রুত নগরায়ন, বন নিধন, শব্দদূষণ ও কীটনাশকের কারণে এদের সংখ্যা অনেক স্থানে কমে যাচ্ছে। শহরের বাগান ও গ্রামীণ গাছপালা হারালে হারিয়ে যাবে এদের গানও।

সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন–

- স্থানীয় পর্যায়ে পাখিবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি,
- স্কুল-কলেজে সচেতনতা বৃদ্ধি,
- বন ও কৃষিজমিতে কীটনাশক ব্যবহারে সংযম।

যদি আমরা আমাদের চারপাশে একটি সুরেলা প্রকৃতি চাই, তাহলে এই গায়ক পাখিদের রক্ষা করা আমাদেরই দায়িত্ব। কারণ তাদের গানেই লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের প্রকৃত সৌন্দর্য ও প্রাণস্পন্দন।

তথ্যসূত্র:

Ali, S. & Ripley, S.D. (1983). Handbook of the Birds of India and Pakistan.

2.BirdLife International Database, 2024.

3.Khan, M.A.R. (2015). Wildlife of Bangladesh.

4.IUCN Bangladesh (2015). Red List of Bangladesh: Birds.

5.Siddiqui, K.U. et al. (2008). Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh.

লেখক:

সুমন মণ্ডল

কিউরেটর, পদ্মা সেতু জাদুঘর

ফুলের গন্ধের নেপথ্যে

ড. আমানুল ইসলাম



অজানা কোন এক ক্রান্তীয় গহীন অরণ্য ধরে হেঁটে চলেছি। বাতাসে ভেসে এলো মিষ্ট সুবাস। আগ্রহী হয়ে আরো কিছুদূর এগোলাম। এবার পচা মাংসের মতো বেটপ গন্ধ টের পেলাম। অনুসন্ধান করে দেখা গেলো উভয় ধরনের গন্ধের উৎসস্থল ফুল। গন্ধ হোক যেমন তেমন। অনাদিকাল থেকে পুষ্পের শোভা আর সৌরভ অপুষ্পক মানব মনকে রাঙিয়ে এসেছে। কতো না বৈচিত্র্য থাকে এদের গন্ধে। কিন্তু ফুল কেন গন্ধ বিলিয়ে যায়? কেবল মানুষের মনকে সুরভিত করতে? বিজ্ঞানীরা বলছেন ফুলের সৌরভের উদ্দেশ্য মানুষ নয়, বরং পরাগায়নকারীরা। ফুলের ঘ্রাণ আসলে একটি কৌশলের অংশ, যাতে করে পুষ্পক উদ্ভিদ বংশবৃদ্ধি করতে ও তার প্রজাতির বিস্তারণ ঘটাতে পারে। নির্দিষ্ট গন্ধ ফুলে এনে দেয় টিকে থাকার রসদ।

উদ্ভিদের ফুল থেকে বীজ হয়। যা থেকে আবার নতুন একটি উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। কার্যকর বীজ প্রস্তুতের জন্য ফুলের একটি অংশের পরাগরেণু ফুলের অন্য অংশের ডিম্বককে অবশ্যই নিষিক্ত করতে হবে। কিছু উদ্ভিদ স্বপরাগায়িত; এক্ষেত্রে কোন ফুলের পরাগ সেই একই ফুলের গর্ভমুন্ডের উপর পতিত হয়ে ডিম্বক নিষিক্ত করে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে একই প্রজাতির অন্য একটি উদ্ভিদে পরাগ সংযোগের প্রয়োজন পড়ে। একে বলা হয় পর পরাগায়ন।

তাহলে প্রয়োজনের সময় একটি উদ্ভিদ কেমন করে অপর উদ্ভিদ থেকে পরাগরেণু পায়? সেজন্য মাধ্যম বা বাহকের প্রয়োজন হয়। কখনো কখনো মাধ্যাকর্ষণ পরাগরেণুকে জায়গা মতো পড়তে সাহায্য করে। কখনো হাওয়া বয়ে নিয়ে যায়। বায়ু পরাগী ফুল যেমন ধান, গাম, নারিকেল, ঘাসসহ অনেক উদ্ভিদে কোন গন্ধ উৎপন্ন হয়না। অন্যান্য ফুলে পাখি, বাদুড়, প্রজাপতি, কীটপতঙ্গ বা এমনকি ইঁদুর জাতীয় প্রাণী এক ফুল থেকে আরেক ফুলে পরাগ বহনের মাধ্যমে পরাগায়নের দায়িত্ব পালন করে। সব ফুলে সব পরাগ সংযোগকারী বসেনা।



চিত্র: হামং বার্ড পাখির ফুল পরিদর্শন

একটি নির্দিষ্ট পরাগ সংযোগকারী একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদের সার্থক পরাগায়ন ঘটায়। এসব ক্ষেত্রে ফুল বহনকারী প্রাণীদের কিছু প্রণোদনা উপহার দেয়। প্রাণী পরাগ সংযোগকারীরা উপঢৌকনস্বরুপ মিষ্টি শক্তি এবং নেকটার গ্রন্থি থেকে নি:সৃত পুষ্টি সমৃদ্ধ নেকটার (মধু রস) বা প্রোটিনে ভরপুর পরাগ খাওয়ার সুযোগ লাভ করে।

যেসব ফুলের কীটপতঙ্গ ও বাদুড়ের প্রয়োজন হয় তারা আরো এক ধাপ অগ্রগামী থাকে। এরা পুষ্পক সুবাস উৎপন্ন করে। এই সুবাস সঠিক পরাগ সংযোগকারীর জন্য সাদর সম্ভাষণ বা সংকেত হিসেবে ক্রিয়া করে। যখন ফুলের গন্ধ উৎপাদনের পরিমাণ উচ্চ মাত্রায় থাকে এবং সাথে সাথে নির্দিষ্ট পরাগ সংযোগকারীও পরিবেশে সক্রিয় তখন ফুল পরাগায়নের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে।

অর্কিড হোক বা বাগানের গোলাপ- একই প্রজাতির অপর ফুলের পরাগ আনয়নের জন্য পরাগ সংযোগকারীকে আকৃষ্ট করতে হয়। আবার তরুরাজ্যে কিছু রয়েছে দেখতে প্রায় একই রকমের ফুল, কিন্তু ভিন্ন প্রজাতির। তাই নিজেদের পৃথক করে সঠিক পরাগ সংযোগকারী প্রলুব্ধ করতে ফুল অনন্য এক আকর্ষনীয় ঘ্রাণ দিয়ে নিজেকে মাখিয়ে রাখে। বর্ণ, আকার আকৃতিতে ফুলের মধ্যে মিল থাকতে পারে। কিন্তু দুইটি ভিন্ন ফুলের গন্ধ একই রকম হয়না।

দোকানে রাখা পারফিউমের মতো ফুলের ঘ্রাণ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দিয়ে গঠিত যা সহজে বাষ্পীভূত হয় এবং সহজে বাতাসে ছড়িয়ে যায়। রাসায়নিকের ধরন, তার পরিমাণ ও অন্যান্য রাসায়নিকের সাথে আন্ত:ক্রিয়া ফুলের নির্দিষ্ট অনন্য গন্ধ এনে দেয়। গোলাপ ফুলের সৌরভ কমপক্ষে চারশত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিকের সমন্বয়ে গঠিত।

ফুলের সৌরভ সহজে বাষ্পীভূত হয় বলে মানুষ তার ঘ্রাণ অনুভব করে। আর বাতাসের মাধ্যমে তা প্রবাহিত হয়ে পরাগ সংযোগকারীকে আকৃষ্ট করে। ফুলের গন্ধ হতে পারে মিষ্ট ও প্রাণবন্ত, কিংবা হতে পারে তীব্র, বা দুর্গন্ধময়, এমনকি পচা গলিত রকমের। ফুল কোন ধরনের পরাগ সংযোগকারীকে আকৃষ্ট করতে চাচ্ছে এটি আসলে তার উপর নির্ভর করে। একটি প্রস্ফুটিত আপেল বা চেরি গাছ নি:সরিত সৌরভ ভ্রমর, মৌমাছি বা অন্য কোন ধরনের মধুমক্ষিকাকে আকৃষ্ট করে। আবার কেউ যদি আপেল ও চেরি গাছের ঘনিষ্ট আত্মীয় নাশপাতি গাছের দিকে নিজের নাকটা নিয়ে যায় তাহলে তার হয়তো নিদারুণ বিরাগের উদ্রেক হতে পারে। কারণ পরাগ সংযোগকারী মাছিকে আকৃষ্ট করতে এই গাছের ফুলের গন্ধ তীব্র ও অপ্রশান্তিকর হয়ে থাকে। একই ঘটনা দেখা যায় ইন্দোনেশিয়ার ক্রান্তীয় বনে থাকা পৃথিবীর দুর্গন্ধতম ফুলে, শব ফুল নামে পরিচিত। এই ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম অ্যামোরোফোফ্যালাস টাইটানাম। শব ফুল থেকে পচা মাংসের মতো দুর্গন্ধ ছোটে যে দূর থেকেও এর গন্ধে টেকা দায়। পরাগায়ন ঘটাতে মাছি ও বিটল এই গন্ধে আকৃষ্ট হয়।

কিছু ফুল সূর্য অস্তমিত হবার পর গন্ধ নি:সৃত করে। রাতে চলাচলকারী মথ ও বাদুড় গন্ধের মাধ্যমে ফুলের অবস্থান সনাক্ত করে। রাতে প্রস্ফুটিত হওয়া ড্রাগন ফল, সেরিয়াস, কিছু ক্যাকটাসের বৃহৎ সাদা ফুল থাকে। এরা চাঁদের আলোয় নিজেদের উদ্ভাসিত করে। ফলে নিশাচর আগন্তক প্রাণীদের কাছে দৃশ্যমান হয়।



চিত্র: শব ফুল

এসব ফুলের তীব্র গন্ধ পরাগ সংযোগকারীকে অভ্যন্তরে আসতে সহায়তা করে। মিষ্টি নেক্টার পান করার সময় সংযোগকারী পরাগ বয়ে নিয়ে যায়, যা কিনা পরবর্তী পরিদর্শন করা ফুলে যোগ করে। একবার পরাগায়ন সম্পন্ন হলে ফুল পুষ্পীয় সৌরভ উৎপাদন থামিয়ে দেয়। আর সমস্ত শক্তি নিষিক্ত ভ্রূণে সন্নিবেশিত করে। যাতে উদ্ভিদ প্রজনন সফল হতে পারে। আর ফল ও বীজ তৈরির মাধ্যমে প্রজাতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

মানুষ যেখানে ফুলের গন্ধের রহস্য উন্মোচনে নিমগ্ন, সেখানে প্রকৃতির পরাগ সংযোগকারীরা কিন্তু ঠিকই জানে কেমন করে তার পছন্দের ফুল খুজে বের করতে হয়। পরাগায়নের দায়িত্ব পালনকারী এসব সাথীদের বাসস্থান যাতে অটুট থাকে বা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর সাথে মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নটি জড়িত।

তথ্যসূত্রঃ

1. https://theconversation.com/why-do-flowers-smell-15167
2. https://www.kew.org/read-and-watch/why-do-plants-smell

(**ছবিঃ** ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

লেখক:
ড. আমানুল ইসলাম
সভাপতি, অনুসন্ধিৎসু চক্র বিজ্ঞান সংগঠন।

ষষ্ঠ শিল্প বিপ্লব ও বাংলাদেশ

মোঃ রাফি

বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির যুগে প্রবেশ করেছে। বিগত কয়েক শতাব্দীতে একাধিক শিল্প বিপ্লব মানব সভ্যতাকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, অর্থনীতি, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনকি জীবনযাত্রাও এর প্রভাবে বদলে গেছে। আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি ষষ্ঠ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে একটি সময় যেখানে মানব মস্তিষ্ক ও যন্ত্রের একীভূত প্রয়োগ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কগনিটিভ টেকনোলজি ও বায়োটেকনোলজির সংমিশ্রণ নতুন এক সভ্যতার সূচনা করছে। এই বিপ্লব আগের সব শিল্প বিপ্লবের তুলনায় আরও দ্রুত, গভীর ও বহুমাত্রিক। এটি কেবল প্রযুক্তির পরিবর্তন নয়, বরং মানবিকতা, নৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও মানব জীবনের অর্থকেও নতুনভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। বাংলাদেশ, একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে, এই বৈশ্বিক পরিবর্তনের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ উভয়ের মুখোমুখি। প্রশ্ন হলো আমরা কি প্রস্তুত? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের কাঠামো, দক্ষতা উন্নয়ন, এবং প্রযুক্তিগত অবকাঠামো কি এই বিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? নাকি আমরা পিছিয়ে পড়বো এক নতুন বৈষম্যের জালে?

ষষ্ঠ শিল্প বিপ্লব এমন কিছু উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, যেগুলো কেবল তথ্যের আদান-প্রদান বা স্বয়ংক্রিয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের চিন্তা, অনুভূতি এবং জীবনের মৌলিক কাঠামোকে প্রযুক্তির সাথে একীভূত করছে। এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), যা এখন মানুষের মতো বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও এমনকি সৃজনশীল কাজেও সক্ষম। কৃষি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা থেকে শিক্ষা সব ক্ষেত্রেই AI অভাবনীয় পরিবর্তন আনছে। পাশাপাশি কগনিটিভ কম্পিউটিং ও নিউরোটেকনোলজির অগ্রগতি মানুষের চিন্তার ধরন ও নিউরাল নেটওয়ার্কের প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করে যন্ত্রকে মানব মস্তিষ্কের সম্প্রসারণ হিসেবে গড়ে তুলছে। ব্রেইন-মেশিন ইন্টারফেস বা BMI প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োগ আজ আর কল্পনা নয়, বাস্তবতা।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি মানব জিনোমে পরিবর্তন এনে নিরাময়যোগ্য রোগ, দীর্ঘায়ু এবং খাদ্য উৎপাদনে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। কৃষি, চিকিৎসা ও পরিবেশ রক্ষায় এই প্রযুক্তির অবদান অনস্বীকার্য। অন্যদিকে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং প্রচলিত কম্পিউটারের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে তথ্য প্রক্রিয়াকরণে এক বৈপ্লবিক গতি সৃষ্টি করেছে। এটি ক্রিপ্টোগ্রাফি, আবহাওয়া বিশ্লেষণ, ওষুধ আবিষ্কার এবং জটিল ডেটা প্রক্রিয়াকরণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। একইসঙ্গে হিউম্যান-মেশিন ইন্টারফেস, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) ও অগমেন্টেড রিয়েলিটি (AR) প্রযুক্তি বাস্তব ও ভার্চুয়াল জগতকে একীভূত করছে, যা শিক্ষা, বিনোদন, শিল্প ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করছে। রোবটিক্স উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছে, আর ব্লকচেইন প্রযুক্তি তথ্যের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করছে যা ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলবে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এর তরুণ জনগোষ্ঠী। গড়ে ২৫ বছরের নিচে বয়সী এই তরুণরাই আগামী দিনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রকৌশলী, রোবটিক্স নির্মাতা কিংবা জেনেটিক গবেষক হয়ে উঠতে পারে, যদি তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা যায়। কৃষি, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার

বাংলাদেশের বৈশ্বিক উদ্ভাবনী শক্তিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করছে। স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো, AI-ভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবহারে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানো, টেলিমেডিসিন ও AI নির্ভর রোগ নির্ণয় ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা এসব উদ্যোগ বাংলাদেশের জন্য নতুন অধ্যায় খুলে দিতে পারে। তাছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণে ডেটা বিশ্লেষণ, সেন্সর প্রযুক্তি ও স্মার্ট মনিটরিং ব্যবস্থার প্রয়োগ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সরকার, বেসরকারি খাত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুদৃঢ় সমন্বয় প্রয়োজন।

তবে সম্ভাবনার পাশাপাশি বাস্তবতাও অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশ এখনো বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞ জনবলের ঘাটতি একটি বড় বাধা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো মূলত তাত্ত্বিক ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক, যেখানে বাস্তব দক্ষতা, গবেষণাধর্মী চিন্তা ও উদ্ভাবনমুখী পাঠক্রমের অভাব প্রকট। শহর ও গ্রামের মধ্যে প্রযুক্তি প্রবেশাধিকারে অসমতা ডিজিটাল বিভাজন তৈরি করছে। নৈতিকতা, ডেটা সুরক্ষা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার এবং সাইবার নিরাপত্তা সব মিলিয়ে নতুন এক ধরনের চ্যালেঞ্জ সামনে এসেছে। তাছাড়া মেধা পাচার, অর্থাৎ দক্ষ তরুণদের বিদেশমুখী হওয়া, বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে ।

ষষ্ঠ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ কাজে লাগাতে হলে বাংলাদেশকে এখনই কাঠামোগত প্রস্তুতি নিতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতভিত্তিক (STEM) শিক্ষা প্রসার অপরিহার্য। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের রোবটিক্স, কোডিং, ডিজাইন থিংকিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা বিশ্লেষণের মতো দক্ষতায় পারদর্শী করে তুলতে হবে। একই সঙ্গে গবেষণা ও উদ্ভাবনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সরকার ও বেসরকারি খাতের যৌথ অংশীদারিত্বে ইনোভেশন হাব ও গবেষণা ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রযুক্তিকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালনা করা। প্রযুক্তির ব্যবহার যেন সমাজে বৈষম্য বা শোষণ না ঘটায়, বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করে এমন মানবিক নীতি ও নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা জরুরি।

ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানো, তথ্যপ্রযুক্তির সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা করা এসব উদ্যোগ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি শক্ত করবে। একইসঙ্গে প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি-নির্ভর স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা বাংলাদেশ এক অভূতপূর্ব সময় অতিক্রম করছে যেখানে চ্যালেঞ্জ যেমন বড়, তেমনি সম্ভাবনাও অপরিসীম। পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বায়োটেকনোলজি, ন্যানোটেকনোলজি ও কোয়ান্টাম কম্পিউটিং আমাদের ভবিষ্যতের গতিপথ নির্ধারণ করবে। তবে এই পরিবর্তনের স্রোতে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস, দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তুতি। আমাদের যুবসমাজের সৃজনশীলতা, উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, এই তিনটি স্তম্ভেই গড়ে উঠতে পারে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ।

এই বিপ্লব কেবল প্রযুক্তি নির্ভর হবে না; এর ভিত্তি হতে হবে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সমঅধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা। প্রযুক্তির প্রতিটি ধাপ যেন মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে, বরং আরও ঘনিষ্ঠ করে। আমরা চাই এমন এক সমাজ, যেখানে একজন কৃষক, একজন শিক্ষক বা একজন নারী উদ্যোক্তা সবাই প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বপ্ন গড়তে পারবেন। যদি আমরা এখনই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তাহলে আগামী এক দশকের মধ্যেই বাংলাদেশ পরিণত হতে পারে একটি মানবিক ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত রাষ্ট্রে যেখানে নৈতিকতা ও উদ্ভাবন পাশাপাশি হাঁটে, আর প্রযুক্তি কেবল একটি হাতিয়ার নয়, বরং একটি আদর্শের বাহক।

সুতরাং, এখনই সময় প্রস্তুতি নেওয়ার, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়ার এবং ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গড়ার।

রেফারেন্স:

Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.

PricewaterhouseCoopers (PwC). (2024). Global Technology Trends 2024: Shaping the Sixth Industrial Revolution. PwC Insights Report.

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2023). Population and Labour Force Survey 2023. Government of the PeopleÕs Republic of Bangladesh.

Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS). (2024). Startup Ecosystem in Bangladesh 2024. BASIS Research Division.

Government of Bangladesh. (2022). National ICT Policy and Digital Education Framework. Dhaka: Ministry of Education & ICT Division.

United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Human Development Report: Skills and Employment in South Asia. UNDP Publications.

Harvard Business Review. (2023). Brain Drain in the Age of AI: Global Talent Mobility Trends. HBR Research Article.

লেখক:
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
এল. পি. এ ওয়ার্ল্ড, বাংলাদেশ।